মাসিক

নবীনকণ্ঠ

nabinkantho.com

তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

আগস্ট, ২০২৫ খ্রি.। রবিউল আউয়াল-১৪৪৭ হি.
ভাদ্র- ১৪৩২ ব.। ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম-এর মুখপত্র

মাসিক নবীনকণ্ঠ
nabinkantho.com
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

প্রতিষ্ঠা
ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রি. / শাবান, ১৪৪৪ হি. / ফাল্গুন, ১৪২৮ ব.

জুন, ২০২৫ খ্রি. | রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হি.

১০ম সংখ্যা | ৪র্থ বর্ষ

উপদেষ্টা
মুফতী রফিকুল ইসলাম আল-মাদানি হা.

তত্ত্বাবধানে
মুফতী রহমাতুল্লাহ জুবাইর
মুফতী আবুল ফাতাহ কাসেমী
আনিসুর রহমান আফিফি

প্রধান সম্পাদক
মাকামে মাহমুদ

সম্পাদক
উসমান বিন আ. আলীম

নির্বাহী সম্পাদক
বিন-ইয়ামিন সানিম

বিভাগীয় সম্পাদক
কাজী মা'রুফ
রাশেদ নাইব

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সায়েম আহমদ

আমাদের সবার জন্য একটি খুশির খবর। আপনাদের প্রিয় নবীনকণ্ঠের নিজস্ব ওয়েবসাইট উন্মোচন হয়েছে। যেখানে প্রত্যেক সংখ্যার লেখা প্রকাশ করা হয়। গুগলে গিয়ে সার্চ করুন;– nabinkantho.com

সিরাত সংখ্যা

যদি নবীনকণ্ঠ 'প্রিন্ট' করে আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম, তাহলে বেশি ভালো লাগত। আপাতত 'পিডিএফ' করে সম্পূর্ণ ফ্রিতে আপনাদের সামনে দেওয়ার চেষ্টা করছি, আলহামদুলিল্লাহ। দু'আয় আমাদের স্মরণ করবেন।

যোগাযোগ

অস্থায়ী ঠিকানা : বলিয়ারপুর, সাভার, ঢাকা। সম্পাদক : ০১৭৮৯২০৪৬৭৪
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৪৭৬২৯৮০৯ ইমেইল : nobinkanthobnlf@gmail.com

সম্পাদকীয়

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের পালনকর্তা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবি হজরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর, তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর এবং তাঁর সাহাবিদের উপর।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ,
আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের অব্যাহত ভালোবাসা ও আন্তরিক সাড়া পেয়ে 'মাসিক নবীনকণ্ঠ' আবারও হাজির হয়েছে আগস্ট ২০২৫ সংখ্যাটি নিয়ে। পূর্বের সংখ্যাগুলোর মতো এবারও আপনারা আমাদের সাহস জুগিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন। এজন্য আমরা আপনাদের প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। ইনশাআল্লাহ, পূর্বের ন্যায় এই সংখ্যাটিও হবে সেরাদের সেরা। যথাসময়ে আপনাদের মধ্য থেকে সেরা লেখক/লেখিকা ঘোষণা করা হবে।

এবারের সংখ্যা আমরা বিশেষভাবে সাজিয়েছি সিরাত সংখ্যা হিসেবে। কারণ, প্রাণপ্রিয় নবি সা.-এর প্রতি আমাদের ভালোবাসা। তাঁর প্রতি মায়া, শ্রদ্ধা ও দরদ আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত হয়। আমরা চাই তরুণ-তরুণীরা, আমাদের সন্তান-সন্ততীরা যেন এই সংখ্যার উসিলায় হলেও নবিজির জীবনের কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে। তাঁর সিরাত নিয়ে পড়াশোনা করে। অন্যদিকে যারা লিখেছেন, তারাও লেখার উসিলায় হলেও নবিজির জীবন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে-এটাই আমাদের সাফল্য। আলহামদুলিল্লাহ।

আমাদের নবি ছিলেন উম্মতের প্রতি অসীম দরদি। তিনি সারারাত আল্লাহর কাছে কেঁদেছেন তাঁর উম্মতের ক্ষমার জন্য। তিনি প্রতিটি কষ্ট, প্রতিটি আঘাত সহ্য করেছেন উম্মতের হেদায়েতের আশায়। তাই তো সত্যিকারার্থে নবিজির প্রতি ভালোবাসা তখনই বাস্তব হবে, যখন আমরা তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাহর উপর আমল করব, আঁকড়ে ধরব।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: 'যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবে, সে সফল হবে; আর যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।' (সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিম)

এতটুকুই ছিল আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা। আপনাদের দোয়া, ভালোবাসা ও অংশগ্রহণ ছাড়া এটি কখনোই সফল হতে পারে না। আপনারা দোয়া করবেন, যেন মাসিক নবীনকণ্ঠ সবসময় খাঁটি নিয়তে দ্বীনের খেদমতে কাজ করতে পারে। সম্পাদক, লেখক এবং পত্রিকার সঙ্গে জড়িত সবাই যেন আল্লাহর দেওয়া এই সুযোগের সঠিক কদর করতে পারে।
আমাদের আশা, আপনারা মাসিক নবীনকণ্ঠকে আরও ভালোবাসবেন, আমাদের নতুন চালু হওয়া ওয়েবসাইটে ভিজিট করবেন, লেখাগুলো পড়বেন এবং ফেসবুকে শেয়ার করবেন। আপনাদের একটি ছোট্ট কমেন্ট বা শেয়ার আমাদের জন্য বিরাট প্রেরণা।

সবশেষে, এ সংখ্যার যেকোনো ধরনের ভুল আমরা অকপটে স্বীকার করছি এবং পাঠককে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা-তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, আমাদের সকলকে নবিজির সুন্নাহর উপর জীবন গড়ার তাওফিক দান করেন। আমিন ইয়ারব।

-সম্পাদক

নবিজির দাম্পত্য জীবন

মুফতী রহমতুল্লাহ জুবাইর

আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে যখন পৃথিবীতে অন্ধকারের ঘনঘটা আর পাপের বিভিষিকা নেমে এসেছিল, পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, ভ্রান্তি আর গোমরাহীর কালো আঁধারে ঢেকে পড়েছিল; ঠিক তখনই মানবতার মুক্তির দিশারী, বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম আদর্শের ঝান্ডা হাতে নিয়ে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার আগমনে মানবতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। সাধিত হলো চূড়ান্ত বিপ্লব। সকল বর্বরতা আর অরাজকতার অবসান ঘটলো। সমাজে ইনসাফ আর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলো। সর্বত্র রহমতের বারিধারা আর শান্তির সুবাতাস বইতে লাগলো। তাইতো পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে, আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি। (সূরা আম্বিয়া-১০৭)

অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবনেও একমাত্র তার আদর্শই অনুসরণীয় এবং তিনিই উত্তম দিশারী। এজন্য আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখেরাতকে ভয় করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে সুন্দরতম আদর্শ। (সূরা আহযাব-২১)

অন্যত্র ইরশাদ করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা দেন, তা আঁকড়ে ধরো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক। (সূরা হাশর-৭)

উক্ত আয়াতের আহ্বান হলো, জীবনযাত্রার সকল ক্ষেত্রে রাসূলের আদর্শকেই গ্রহণ করতে হবে।

এই বাস্তবতার নিরিখে বলা যায়, মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো দাম্পত্য জীবন, যা মানুষের জীবনকে সুন্দর সুশৃঙ্খল ও উপভোগ্য করে তোলে। এক্ষেত্রেও সুখ শান্তি আর পূর্ণাঙ্গ সফলতার জন্য নববী আদর্শের বিকল্প নেই। নবীজির সেই আদর্শ দাম্পত্য জীবন কেমন ছিলো!

আসুন জেনে নিই;

স্ত্রীদের সাথে আচরণ:

স্ত্রীদের সাথে প্রেম-ভালোবাসা আর সুন্দর আচরণ ছিল নবীজির দাম্পত্য জীবনের অন্যতম ভূষণ। উত্তম আচরণে তিনি ছিলেন অনন্য, অসাধারণ। যা ছিল উম্মতের জন্য অনুসরণীয় ও মডেল।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তোমরা নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করো। (সূরা নিসা-১৯)

অনুরূপভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ওহে আমার উম্মত! তোমরা নারীদের সাথে সৎব্যবহার করবে। (সহীহ বুখারী-৫১৮৫)

তিনি আরো ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি, যে তার পরিবারের কাছে সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের কাছে তোমাদের চেয়ে উত্তম। (জামে তিরমিযী-৪২৩৩)

আল্লাহ তাআলা আখলাকে নববীর ব্যাপারে ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী। (সূরা আল-কলম-৪)

এজন্য নবীজির দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে আয়াতে বর্ণিত রাসূলের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, এ কোরআনই হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র। (মুসনাদে আহমদ ৬/১৬৩)

অর্থাৎ কুরআনে যে সকল উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে সে সবই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছিলেন কোরআনী চরিত্রমালার জীবন্ত প্রতীক।

স্ত্রীদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা:

স্ত্রীদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আচরণ ছিল সীমাহীন ভালোবাসাপূর্ণ। স্ত্রীদের জীবদ্দশায় যেমন তাদের প্রতি ভালোবাসা সম্মান প্রকাশ করতেন তেমনি তাদের মৃত্যুর পরও তাদের প্রতি মনের ভালোবাসা ও সম্মান বজায় রেখেছেন।

হযরত খাদিজা রা. সম্পর্কে নবীজি বলেন, আমার অন্তরে তার ভালোবাসা ঢেলে দেওয়া হয়েছে। একই বর্ণনায় আম্মাজান আয়েশা রা. বলেন, যখন ছাগল যবেহ করা হতো, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, এখান থেকে খাদিজা রা.-এর সহপাঠীদের (বান্ধবীদের) জন্য পাঠাও। (সহীহ মুসলিম-২৪৩৫)

তার আলোচনা এলেই নবীজি তার প্রশংসা করতেন। তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তেমনিভাবে আয়েশা রা.-কেও তিনি অত্যন্ত মহব্বত করতেন। তার এ ভালোবাসার কথা তিনি গোপন রাখতেন না।

আমর বিন আস রা. একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে? তিনি উত্তর দিলেন, আয়েশা। আমর রা. এরপর জানতে চাইলেন, পুরুষদের মধ্যে কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন, আয়েশার বাবা। আমর রা. পূণরায় জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? উত্তরে নবীজি বললেন, ওমর ইবনে খাত্তাব রা.। (সহিহ বুখারী-৩৬৬২)

তিনি যে একজন অসাধারণ প্রেমময় স্বামী ছিলেন তারই প্রতিচ্ছবি রয়েছে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর নামকে আদরাচ্ছলে সংক্ষিপ্ত করে 'হে আয়েশ' বলে সম্বোধন করার ভেতরে।

একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বলেন, হে আয়েশ! জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম এই মাত্র তোমাকে সালাম দিয়ে গেলেন। (মুসলিম শরীফ-২৪৪৭)

স্ত্রীদের অধিকারে সমতা রক্ষা:

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (স্ত্রীদের মাঝে) বন্টন করতেন এবং (বন্টনে) ইনসাফ করতেন। (সুনানে আবু দাউদ-২১৩৪)

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন (সফরের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন স্ত্রীদের মাঝে লটারি ধরেছিলেন। (সহীহ বুখারী-৫২১১)

উপরোক্ত বর্ণনাগুলো থেকে স্ত্রীদের মধ্যকার ইনসাফ ও সমতা রক্ষার বিষয়টি অনুমেয়।

স্ত্রীদের প্রতি ধৈর্য ও সহনশীলতা:

নবীজি স্ত্রীদের সবসময় মমতার চাদরে আগলে রাখতেন। তাদের থেকে প্রাপ্ত অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসংগতিপূর্ণ আচরণগুলোতে তিনি ধৈর্য ধারণ করতেন। তাদের ছোটখাটো ভুলগুলোকেও তিনি এড়িয়ে যেতেন। এ কারনেই দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত সুখ যার সবই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারে।

কোনো একবার আবু বকর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ওই সময় তিনি আয়েশা রা.-কে জোর গলায় রাসূলের সঙ্গে কথা বলতে শুনলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি ঘরে ঢুকলেন। এরপর তিনি আয়েশা রা.-কে হে উম্মে রুমানের মেয়ে বলে সম্বোধন করলেন। আর তাকে ধরে বললেন, তুমি রাসূলের সঙ্গে এভাবে উঁচু গলায় কথা বলছ! ঠিক ওই সময় নবীজি বাবা ও

মেয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবু বকরকে থামালেন। আবু বকর রা. বের হয়ে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা রা.-কে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে বললেন, দেখলে কীভাবে তোমাকে ওই লোকের হাত থেকে বাঁচালাম? এর কিছুক্ষণ পর আবু বকর (রা.) আবারও প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ভেতরে এসে তাদের দুজনকেই হাসতে দেখলেন। (মুসনাদে আহমদ-১৭৯২৭)
নারীদের সঙ্গে সবসময় ইতিবাচক মনোভাব ও সহনশীল আচরণ বজায় রাখা একজন দায়িত্বশীল স্বামীর পরিচয়। তাদের ওপর অযাচিত চাপ প্রয়োগ করা বা অল্পতেই রেগে যাওয়া ঘৃণিত কাজ হিসেবে বিবেচ্য।

স্ত্রীদের সাথে সময় কাটানো:
স্ত্রীদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে সময় কাটানো স্ত্রীদের হক এবং এটি দাম্পত্য জীবনের খুবই উপভোগ্য বিষয়ও বটে।
আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. বলেন, আসরের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কাছে আসতেন। সবার সঙ্গে দেখা করতেন। এরপর একজনের সঙ্গে একান্তে সময় কাটাতেন। (সহীহ বুখারি-৫২১৬)
অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, এমন দিন খুব কমই যেত, যেদিন নবীজি আমাদের সবার কাছে আসতেন না। সব স্ত্রীর সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হতেন। তবে সহবাস করতেন না। অতঃপর যার কাছে রাতযাপনের পালা হতো, তিনি সেখানে রাতযাপন করতেন। (সুনানে আবু দাউদ-২১৩৫)
অনুরূপভাবে হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই রাতে সকল স্ত্রীর নিকট যেতেন। (সহীহ বুখারী-৫০৬৮)
হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি ঋতুবতী অবস্থায় থাকলেও নবীজি আমার কোলে ঠেস দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। (মুসলিম শরীফ-৩০১)
হযরত মাইমুনা রা. বলেন, আমার ঋতুস্রাবের সময় নবীজি আমার সাথে একই কাপড়ের নিচে ঘুমাতেন। (মুসলিম শরীফ-২৯৫)

স্ত্রীদের সাথে পানাহার:
হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি ঋতুস্রাবের অবস্থায় কিছু পান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিতাম। আর তিনি আমার মুখ রাখার স্থানে মুখ রেখে পান করতেন এবং আমি হাড়ের মাংস খেয়ে শেষ করলে তিনি তা গ্রহণ করে আমার মুখ লাগানোর স্থানেই মুখ লাগাতেন। (মুসলিম শরীফ-৩০০)

স্ত্রীদের সাথে রসিকতা ও বিনোদন:
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈধ পন্থায় রসিকতা ও বিনোদনের মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে আনন্দ ও আন্তরিকতার পরশ জোগাতেন।
হযরত আয়েশা রা. বলেন, একবার আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভ্রমণে বের হলাম। সে সময় আমি অল্প বয়সী ছিলাম এবং শারীরিক গঠনেও পাতলা ছিলাম। তখনো মোটা তাজা হইনি। তিনি সাহাবীদেরকে বললেন, তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও। তারা যখন সামনের দিকে অগ্রসর হল, তখন তিনি আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি। অতঃপর আমি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলাম এবং আমি তার উপর বিজয় লাভ করলাম। তিনি সে দিন আমাকে কিছুই বললেন না। যখন আমি শারীরিকভাবে মোটা হলাম ও ভারী হলাম এবং তাঁর সাথে কোন এক সফরে বের হলাম। তিনি সাহাবীদের বললেন, তোমরা সামনের দিকে অগ্রসর হও। তারা যখন সামনে অগ্রসর হল। তখন তিনি আমাকে বললেন, এসো আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করি। এবারের প্রতিযোগিতায় তিনি আমার আগে চলে গিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আজকের জয় সেই দিনের প্রতিশোধ। (মুসনাদে আহমদ ৬/২৬৪)
এছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ দাম্পত্য জীবনের আরো অনেক খুঁটিনাটি দিক রয়েছে, যা সীরাতের অধ্যায়ে বিষদ আকারে বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে যদি আমরা সামান্য উপকৃত হতে পারি, সেটাই আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি ও সৌভাগ্যের বিষয়। আল্লাহ তাআ'লা সীরাতে নববীর আলোকিত পথে আমাদের দাম্পত্য জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখক, শিক্ষাসচিব, মারকাযুত তারবিয়াহ বাংলাদেশ সাভার, ঢাকা ।

সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে

নবিজি ﷺ

• আব্দুল্লাহ আলমামুন আশরাফি হাফি.

মানবসমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার সৌরভ ছড়িয়ে দেওয়া ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশন। সে লক্ষ্যেই ইসলাম সকলপ্রকার সহিংসতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। ইসলাম তার অনুসারীদের মুসলিম বা অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সুউচ্চ মূল্যবোধ এবং উন্নত চারিত্রিক গুণাবলিসম্পন্ন আচরণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে। ঠিক তেমনিভাবে সব ধরনের অন্যায়, সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণের নির্দেশনা দেয়। সবার সঙ্গে সুন্দর আচরণ করা কুরআন মাজিদের সরাসরি নির্দেশনা। আল্লাহু সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আদেশ দিচ্ছেন; 'তুমি মন্দকে প্রতিহত করো এমন পন্থায়, যা হবে উৎকৃষ্ট। ফলে তোমার ও যার মধ্যে শত্রুতা ছিল সে সহসাই হয়ে যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।' সুরা হা-মিম সাজদা: ৩৪]

বস্তুত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবনাচার ছিল কুরআন নির্দেশিত সেসব সুউচ্চ মূল্যবোধের উত্তম প্রয়োগ।

একটি বক্তব্যে জাহিলিয়্যাতের চিত্রায়ণ:

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সমাজে চোখ মেলেছেন, বসবাস করেছেন সে সমাজে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড খুব স্বাভাবিক বিষয় ছিল। হিংস্রতা, লুটতরাজ এবং সন্ত্রাসী তাণ্ডবের সমস্যা সেখানে ভয়ঙ্কররূপে অবস্থান করছিল। এর চর্চার রূপ ছিল এমন, যেন তা হিংস্র ও অত্যাচারীদের অধিকার। সেই সমাজের সঠিক চিত্র পাওয়া যায় জাফর বিন আবু তালেব রা. বাদশা নাজ্জাশির নিকট কুরাইশ অমুসলিম সমাজের ব্যাপারে যে বিবরণ প্রদান করেছেন তার মাঝে। তিনি বলেছিলেন,

'হে বাদশা, আমরা ছিলাম শিরকের ওপর অটল এক জাতি। মূর্তিদের ইবাদত করতাম। মৃত জীবজন্তু ভক্ষণ করতাম। প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করতাম। অন্যায় রক্তপাতসহ অন্যের প্রতি যত ধরনের অন্যায় করা যায়, সবই ছিল আমাদের নিকট বৈধ। হালাল হারাম বলতে আমাদের কাছে কোনো বিষয় ছিল না।' (আসসিরাতুন নাবাবিয়্যা: ইবনে হিশাম: ১/৩৩৫)

এছাড়া যদি সেই সমাজে মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়ার প্রবণতার দিকে লক্ষ করি, তবে এটিকে তৎকালীন আরবসমাজের হিংস্রতা সংক্রান্ত সমস্যার গুরুতরতার ব্যাপারে প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। তাই এ সমস্যা সমাধানে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনটা জিনিস হারাম করেছেন এবং তিনটা জিনিস সম্পর্কে নিষেধ করেছেন। হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, মেয়েদের জীবন্ত কবর দেওয়া... ।(সহিহ বুখারি-৮৪৪)

সন্ত্রাস নির্মূলে বিস্ময়কর নববি সমাধান:

প্রথম ধাপ;

সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর বিস্ময়কর নববি সমাধান এনেছেন। সমাজে যে সমাধান প্রয়োগ করা হয়েছে প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা ও দয়া-ভালোবাসার মিশেলে পরিপূর্ণ ইসলামি আদর্শের আলোকে। সুতরাং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রথমে তাঁর সাহাবিদের অন্তরে আল্লাহ তাআলার সার্বক্ষণিক দর্শনের চিন্তা প্রবেশ করিয়েছেন। এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলা এবং বান্দার অধিকারগুলো আদায় করার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে ওঠে। ফলে সে আর সহিংসতা প্রদর্শন করে না। সন্ত্রাসে লিপ্ত হয় না। কারণ, সে জানে আল্লাহ তাআলা তাকে সর্বক্ষণ দেখছেন। তার সকল গোপন বিষয়ও তিনি জানেন। হজরত মুআজ রা. থেকে বর্ণনা রয়েছে। তিনি একবার রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'তুমি এমনভাবে

আল্লাহ তাআলার ইবাদত করো, যেন তুমি তাঁকে সরাসরি দেখছ।' (মুসনাদে আহমাদ: ৬১৫৬)

দ্বিতীয় ধাপ;
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও সহিংসতা নির্মূলে দ্বিতীয় ধাপে সমাজের কাঠামোর প্রতি নজর দেন। বস্তুত একটি সমাজ সুসংহত হওয়ার জন্য বেশ কিছু মূল্যবোধ নির্ধারণ ও তার চর্চা জরুরি।

সমাজ বিনির্মাণে কোমলতা ও সহানুভূতি:

সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝে কোমলতা, সহানুভূতি ও ন্যায়পরায়ণতার উন্মেষ ঘটানো। সকলেই সকলের প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়পূর্ণ আচরণ করবে। কোনো জাতি ধর্ম বা বংশের কারণে কারও প্রতি কোনো পার্থক্য করা হবে না। যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোমল, দয়ালু। তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার কারণে যা দান করেন কঠোরতা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে তা দান করেন না।' (সহিহ মুসলিম: ২৫৯৩)

কোমলতার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি:

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পুরো জীবনচরিতে কোমলতা ও বিনম্র আচরণের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। তাঁর জীবনে কোমল আচরণের অনেক দৃষ্টান্তের কথা সিরাতের পাতায় অমলিন হয়ে আছে । একটি দৃষ্টান্ত দেখুন;
হজরত আয়েশা রা. বর্ণনা করেন, একবার একদল ইহুদি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে প্রবেশ করল। এরপর (প্রবেশের সময়) তারা বলল, "السَّامُ عَلَيْكُمْ (তোমার মৃত্যু হোক)।' তাদের কথাগুলো আমি বুঝতে পারলাম। তখন আমি বললাম, 'বরং তোমাদের ওপরই মৃত্যু ও লানত বর্ষিত হোক। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, শান্ত হও আয়েশা, নিশ্চয় আল্লাহ কোমল। তিনি সকল কাজে কোমলতা পছন্দ করেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'হে আয়েশা, তুমি কঠোরতা ও মন্দালাপ থেকে বিরত থাকো।' আয়েশা রা. বলেন, তখন আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কি শোনেননি তারা কী বলেছে?
নবিজি ﷺ বললেন, 'তাদের উত্তরে আমি বলেছি, এবং তোমাদের উপরও। (সহিহ বুখারি: ৬০২৪)

অন্যায়কারীর সাথে অবস্থাভেদে দয়ার্দ্র আচরণ:

সমাজের অন্যায়কারীদের একটা পর্যায় দয়ার্দ্র মনোভাব রাখা উচিত। কারণ, অনেক সময় সামান্য একটু দয়া ও সহমর্মিতার আচরণও বহু সহিংসতা ও উগ্রতাকে অপসারিত করে দেয়, পরস্পরের মাঝে ঘনিষ্ঠতা তৈরি করে। আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ জীবনের দিকে লক্ষ করলে তাঁর নিকট এই মূল্যবোধের মহত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হব। একটি গল্প শুনুন;
হজরত আনাস রা. বলেন, একদিন আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে মসজিদে বসে ছিলাম। এ সময় হঠাৎ এক বেদুইন এসে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তা দেখে রাসুলের সাহাবিগণ 'থামো... থামো... বলে তাকে ধমকাতে লাগলেন।।
আনাস রা. বলেন, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন, 'তোমরা এ অবস্থায় তাকে বাধা দিও না; এখন তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও।' সাহাবিরা বিরত রইলেন। বেদুইন লোকটি প্রস্রাব সেরে নিল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে কাছে ডেকে খুব শান্তভাবে কোমলকণ্ঠে বললেন, 'দেখো, এটা হলো মসজিদ। এখানে প্রস্রাব করা কিংবা ময়লা-আবর্জনা ফেলা উচিত নয়। বরং এটা হলো আল্লাহর জিকির, নামাজ আদায় এবং কুরআন পাঠ করার স্থান।'

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ একজনকে পানি আনতে আদেশ করলেন। সে এক বালতি পানি নিয়ে এলো এবং সেই পানি প্রাবের ওপর ঢেলে দিলো।(সহিহ বুখারি: ২১৯)

মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য বজায় রাখা:

সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে কার্যকরী একটি উপায় হচ্ছে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ধর্মের বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করা। এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
'নিশ্চয় দ্বীন হচ্ছে সহজ বিষয়। দ্বীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে, দ্বীন তার ওপর জয়ী হয় (অর্থাৎ দ্বীন পালনে সে অক্ষম হয়ে যায়)। কাজেই তোমরা মধ্যমপন্থায় আমল করো, (আমল করার ব্যাপারে) সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকালে, দুপুরে ও রাতের কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট) সাহায্য চাও। (সহিহ বুখারি: ৩৯)

সুতরাং দ্বীন ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি এমন একটা বিষয়, যা সহিংসতার দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং এর মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে জোরপূর্বক নিজের মতামত গ্রহণে বাধ্য করা হয়।

শান্তিকামী মানসিকতা তৈরি:

চতুর্থ বিষয় হলো, সমাজের সকল সদস্যের মাঝে শান্তিকামী হওয়ার মানসিকতা তৈরি। এটি এমন এক মূল্যবোধ, যার দ্বারা গুণান্বিত মানুষকে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর প্রতিপালকের

নিকট এবং সমাজের মাঝে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এমনকি এই শান্তিকামী মনোভাবের সুদূর বিস্তৃত সীমাও তিনি আমাদের নিকট বিবৃত করেছেন।

হজরত জাবের রা. বলেন, একবার এক লোক রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসুল, কোন মুসলমান শ্রেষ্ঠ?'

উত্তরে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

যে মুসলমানের জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে, সে মুসলমানই শ্রেষ্ঠ। (৩৫৬)

সহিংসতা নির্মূলে আরও নববি কর্মপন্থা:

রাসুলুল্লাহ ﷺ সমাজের সহিংসতা ও উগ্রতার সমস্যা সমাধানের জন্য শুধু এই সামাজিক মূল্যবোধের ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেননি। বরং তিনি এমন কিছু আদেশ-নিষেধও প্রদান করেছেন, যেগুলো সমাজের সহিংসতা বন্ধ করে দয়া, মমতা ও সম্প্রীতির প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে। যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে নারীদের সাথে কঠোরতা করতে নিষেধ করেছেন। হজরত ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

'তোমরা আল্লাহ তাআলার বাদিদের আঘাত করবে না।' এরপর একবার উমর রা. নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, 'মহিলারা তাদের স্বামীদের অবাধ্য হচ্ছে।'

এই কথার প্রেক্ষিতে নবিজি তাদেরকে আঘাত করার অনুমতি প্রদান করলেন। তবে এরপর অনেক মহিলা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদের নিকট এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে (আঘাতের) অভিযোগ আরোপ করল। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'মুহাম্মাদের পরিবারের নিকট অনেক মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এসেছে। মূলত যারা স্ত্রীদেরকে প্রহার করে, তারা উত্তম লোক নয়। (সুনানে আবু দাউদ: ২১৪৬)

অপরাধের ভয়াবহতা তুলে ধরা:

সমাজ থেকে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে একটি কার্যকরী উপায় হচ্ছে অপরাধের ভয়াবহতা তুলে ধরা। যাতে মানুষের অন্তরে অপরাধের প্রতি ঘৃণাবোধ তৈরি হয়।

নবিজি ﷺ কার্যকরী এই কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন।

আবুল হাকাম আল-বাজালী রহ. থেকে বর্ণিত, আমি আবু সাঈদ খুদরি ও আবু হুরাইরা রা.-কে বর্ণনা করতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আসমান-জমিনের মধ্যে বসবাসকারী সকলে একত্রে মিলিত হয়েও যদি একজন মুমিনকে মেরে ফেলার কাজে শরিক থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। (জামে' তিরমিজি- ১৩৯৮)

রাসুলুল্লাহ ﷺ নির্বিঘ্ন মানুষদের আতঙ্কিত করতেও নিষেধ করেছেন। পাশাপাশি যেসব উপায়ে মানুষকে ভীতিপ্রদর্শন ও আতঙ্কিত করা হয়, তার সকল উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমও বন্ধ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন,

যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রতি লৌহ নির্মিত (অস্ত্র) দ্বারা ইঙ্গিত করে, তাহলে সে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে; যদিও সে তার আপন ভাই হয়। (সহিহ মুসলিম ২৬১৬)

উগ্রদের রুখতে দণ্ডবিধির যথার্থ ব্যবহার:

কোমলতা ও সুন্দর আচরণে মাধ্যমে সমাজের একটা বড় থেকে অপরাধ প্রবণতা দূর করা গেলেও কিছু কিছু বিচ্যুত মানুষ সমাজে থাকবেই। তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে প্রলুব্ধ করে সমাজকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে এবং নিজেরা সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হতে। তাদের জন্যই প্রয়োজন হয় শরিয়তের এমন সব আইন ও দণ্ডবিধানের, যেগুলো তাদের এসব অন্যায়-অপরাধ থেকে বিরত রাখতে পারে। শরিয়তের এমন কিছু দৃষ্টান্ত হলো, কিসাস, বিদ্রোহ, ডাকাতি ইত্যাদির দণ্ডবিধান।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি এটাই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত-পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে দূর করে দেওয়া হবে। এটা তো তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। (সুরা মায়িদা: ৩৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সকল দণ্ড বাস্তবায়নে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। কেননা এর মাঝে গোটা সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল। তাই সমাজ থেকে সহিংসতা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূলে নবিজি ﷺ এর কর্মপন্থা অনুসরণের বিকল্প নেই।

শিক্ষক, গবেষক ও আলোচক

নবিজির রাজনৈতিক দর্শন:

এক মহান রাষ্ট্রনায়কের রূপরেখা

মুফতি উবাইদুল্লাহ তারানগরী

তিনি ছিলেন সময়ের বুক চিরে উঠে আসা এক মহান আলোকবর্তিকা, যাঁর দীপ্তি নিঃশব্দে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত পৃথিবীর হৃদয়ে। তিনি ছিলেন এক আবেগ, এক অভিপ্রায় ও এক অনন্ত আলো। যাঁর উপস্থিতি সময়ের সীমা ছুঁয়ে যায়। তাঁকে খুঁজতে ইতিহাসের পাতায় হয় না; তিনি আছেন মানুষের হৃদয়ে, বিশ্বাসের ভেতর এবং অশ্রুসিক্ত প্রার্থনার গভীরে।

তিনি মুহাম্মদ। তিনি আহমাদ। তিনি আল্লাহর প্রিয় রাসুল সা.। কান্তার মরুতে দাঁড়িয়ে যিনি মানবতার নতুন মানচিত্র এঁকেছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব কেবল আধ্যাত্মিক ছিল না; বরং তা ছিল এক পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক বাস্তবতা, মানবিক রাষ্ট্রদর্শন ও বিশ্বশান্তির সুসংবাদ।
তাঁর মতো নিখুঁত, উদার ও সাহসী কোনো দৃষ্টান্ত এই পৃথিবী কখনো দেখেনি। দেখবেও না। তাঁর রাজনীতি ছিল শিল্পকলা। যেখানে নেতৃত্ব মানে ছিল জবাবদিহি, ক্ষমতা মানে সেবাকাজ, আর প্রশাসন মানে ইনসাফ ও মানবতার ছায়াতল। অসহায়-সহায় সকলের জন্য ছিল শান্তিপূর্ণ আশ্রয়স্থল। প্রকৃতপক্ষে একটি সুন্দর পৃথিবী ও নিরাপদ সমাজ গড়ে ওঠে তার বাসিন্দাদের সততা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে। এই লক্ষ্যেই নবি ﷺ এক আলোকোজ্জ্বল, নুরানী, সৎ ও যোগ্য কাফেলার গঠন করেছিলেন, যাঁদের বলা হয় আসহাবে রাসুল বা সাহাবা। তাঁরা এতটাই গুণবান ছিলেন যে, আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। নবিজি নবুওয়তপ্রাপ্তির পর মক্কি জীবনের ১৩ বছর অক্লান্ত সাধনা করে তাঁদের ইসলামের ছাঁচে গড়ে তুলেছেন। তিনি নিবেদিত ছিলেন ব্যক্তি গঠন ও মানবতা নির্মাণে। আঁধার থেকে আলোর পথে এনে তাঁদের প্রাণবন্ত জীবনের অধিকারী বানিয়েছেন। পরে মাদানি জীবনের ১০ বছরে তিনি শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন। গড়ে তুলেছেন এক বৈষম্যহীন সমাজ ও রাষ্ট্র-যা আজও পৃথিবীবাসীর জন্য অনুসরণীয় এক আলোকবর্তিকা। এমনকি অমুসলিমরাও অকপটে তা স্বীকার করেছেন। রাসুলুল্লাহ ও তাঁর সাহাবিদের প্রতি তারা রেখেছেন অকুণ্ঠ প্রশংসা।

নবিজির রাজনৈতিক দর্শন কেমন ছিল, তার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র এখানে তুলে ধরা হলো;

ঈমান ও ন্যায়ের ছায়ায় রাষ্ট্রগঠন

নবিজির রাষ্ট্র কাঠামো কোনো রাজতান্ত্রিক সিংহাসন বা অহমিকার প্রাচীরে গড়ে ওঠেনি। এর ভিত্তি ছিল ঈমান, আর আলোকচ্ছটা ছিল আল্লাহভীতি। প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল আল্লাহর বিধানে পরিপুষ্ট। তিনি কুরআনের সেই কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন, যেখানে উচ্চারিত হয়- "নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ও সদাচারের আদেশ দেন।" (সুরা আন-নাহল: ৯০)

"তুমি তাদের মাঝে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুযায়ী বিচার কর।" (সুরা আল-মায়িদা: ৪৯)।

তাঁর রাষ্ট্র ছিল ন্যায়ের প্রতীক-যেখানে দুর্বল ছিল নিরাপদ আর শক্তিশালী ছিল জবাবদিহির কাঠগড়ায়।

মদিনার সনদ: বহুজাতিক রাষ্ট্রের সুবাসিত নকশা

মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক ঐতিহাসিক চুক্তি-যা ছিল বহুজাতিক সহাবস্থানের প্রথম লিখিত দলিল। মুসলমান, ইহুদি, মুশরিক-সকলেই ছিলেন রাষ্ট্রের নাগরিক; সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ছিল নিশ্চিত। এমন সহনশীলতার দৃষ্টান্ত আজকের জাতিসংঘেরও আদর্শ হতে পারে। ১৯৪৮ সালে গঠিত মানবাধিকার কমিশনের সুন্দর ধারাগুলোর চেয়েও অধিক সুন্দর, সর্বোত্তম এবং চিরকাল প্রাসঙ্গিক নীতিমালা নবিজির আলোকোজ্জ্বল রাজনৈতিক দর্শনে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। তাঁর নীতি-আদর্শেই আউস ও খাজরাজ গোত্রের শতবর্ষের দাঙ্গা মুহূর্তে নিভে গিয়ে, তারা পরিণত হয় ভাইয়ে ভাইয়ে।

পরামর্শভিত্তিক শাসন: এক কোমল অথচ দৃঢ় নেতৃত্ব

নবিজি ছিলেন এমন এক নেতা, যিনি একক কর্তৃত্বের পরিবর্তে শূরা বা পরামর্শের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। যুদ্ধ হোক বা পারিবারিক নীতি, সমাজনীতি বা রাজনীতি-ছোট-বড় সকল বিষয়েই তিনি সাহাবিদের মতামতকে দিতেন বিশেষ গুরুত্ব। কুরআনে আল্লাহ বলেন- "আপনি তাদের সঙ্গে পরামর্শ করুন।" (সুরা আলে ইমরান: ১৫৯)।

"যে ব্যক্তি পরামর্শ করে, সে কখনো লাঞ্ছিত হয় না।" (তাবারানি, আউসাত)

এ যেন গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের সূচনালগ্ন, যেখানে জনগণের কণ্ঠস্বরই ছিল রাষ্ট্রচালনার চালিকাশক্তি। কোনো ভয়ভীতি ছিল না, ছিল এক প্রশান্ত সবুজ পরিবেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

ন্যায়বিচার ও সমতার নির্ভীক ঘোষণা

নবিজি ছিলেন বিচারের আসনে অকুতোভয় ও আপসহীন। প্রিয়তম কন্যার বিরুদ্ধেও যদি আইন প্রয়োগের প্রয়োজন হতো, তবুও তা স্থগিত হতো না। সিরাত ও হাদিসের পাতায় তাঁর চির-উজ্জ্বল ঘোষণা, "আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে আমি তার হাত কেটে দিতাম।" (বোখারি, হাদিস: ৬৭৮৮)।

এই বাক্য শুধু আইনের কঠোরতা নয়; বরং তা ইতিহাসে রাষ্ট্রনায়কসুলভ নৈতিকতার এক অমোঘ বেদী।

শান্তির বার্তা ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতা

নবিজি পার্শ্ববর্তী রাজাদের নিকট শান্তির আহ্বান ও ইসলামের দাওয়াত পাঠান। তাঁর কূটনৈতিক ভাষা ছিল মার্জিত, আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তিনি বলেন- "ইসলাম গ্রহণ করো, নিরাপদ থাকবে।" (বোখারি, হাদিস: ৭৫)।

রোম, পারস্য, আবিসিনিয়ার রাজাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত এই চিঠিগুলো আজও বিশ্ব কূটনীতির জন্য মডেল হতে পারে। এর ভাষা, সৌজন্য ও শান্তির বার্তা এক অনন্য পথনির্দেশিকা।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সংখ্যালঘু সুরক্ষা

মদিনা ছিল এক বাস্তব প্লুরালিস্ট সমাজ, যেখানে অমুসলিমদের উপাসনালয় ছিল নিরাপদ, তাদের অধিকার ছিল রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ছায়াতলে। নবিজি ঘোষণা করেন, "যে অমুসলিম নাগরিকের ওপর জুলুম হবে, কিয়ামতে আমি তার বিপক্ষে দাঁড়াব।" (আবু দাউদ: ৩০৫২)

এ শুধু রাজনৈতিক সহনশীলতা নয়; বরং মানবতার শ্রেষ্ঠ ঘোষণা।

যুদ্ধনীতি: নৈতিকতা ও সংযমের অনুপম পাঠ

যুদ্ধ তাঁর কাছে ছিল প্রতিরক্ষা, নিপীড়ন নয়। তাঁর সেনাবাহিনী ছিল নৈতিকতার আদর্শ উদাহরণ, যেখানে বৃদ্ধ, শিশু, নারী ও উপাসনালয়ের বিরুদ্ধে আঘাত ছিল নিষিদ্ধ। তিনি বলেন, "যারা যুদ্ধ করে না, তাদের ক্ষতি কোরো না।" "নারী, শিশু, বৃদ্ধ, গাছপালা ও উপাসনালয়ে হাত দিয়ো না।" (আবু দাউদ: ২৬১৪)

"যদি তারা শান্তির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে তুমিও শান্তির দিকে ঝুঁকো।" (সুরা আনফাল: ৬১)।

তাঁর যুদ্ধনীতি, কুরআনের নীতিমালায় এবং জীবনাচরণে, আজকের আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের বহু পূর্বেই রচিত হয়েছিল। কথিত শান্তির বিশ্বমোড়লরা যদি তাঁর নীতি থেকে শিক্ষা নিতেন, পৃথিবীর রূপ অন্যরকম হতে পারত।

জনকল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র: মানবতার মা যেমন হওয়া উচিত

নবিজির রাষ্ট্র ছিল একটি জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র-যেখানে বায়তুল মাল ছিল গরিব, এতিম, বিধবা ও অক্ষমদের আশ্রয়স্থল। কুরআনে এসেছে, "তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক আছে।" (সুরা যারিয়াত: ১৯)
এই রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল শুধু নীতির নয়, বাস্তব দয়ার এক জলছবি।

শ্রমজীবীর মর্যাদা: কর্মের ঘামে গড়া সম্মান
নবিজি বলেন, "তোমাদের অধীনস্থদেরকে তোমরা নিজের ভাই মনে করো।" (বোখারি: ৩০)।
"শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ করো।" (ইবনে মাজাহ: ২৪৪৩)।
এই বাণী শুধু স্লোগান নয়, বরং সমাজ প্রতিষ্ঠার এক বাস্তব অঙ্গীকার। শ্রমিকের ঘামে গড়া সম্মান, এটাই ছিল তাঁর সমাজদর্শনের বৈশিষ্ট্য।

ইনসাফের আলোয় উদ্ভাসিত বিচারব্যবস্থা
"হে মুমিনগণ! তোমরা ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হও।" (সুরা নিসা: ১৩৫)।
এই কুরআনি আহ্বান বাস্তবায়িত হয়েছিল নবিজির হাতে, এমন এক বিচারে, যেখানে আত্মীয়তা, ধনসম্পদ বা প্রভাব কোনো কাজে আসত না।

নেতৃত্ব মানে জবাবদিহিতা:
নবিজি বলেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।" (সহিহ বুখারি: ৮৯৩)।
এই এক বাক্যেই তিনি নেতৃত্বের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন। নেতৃত্ব ছিল না সিংহাসন-বরং আমানতের এক ভার।

নারীর সম্মান ও অধিকারের ঘোষণা:
যেখানে নারীদের ছিল না কোনো সামাজিক অবস্থান কিংবা সম্মান, সেখানে তিনি তাঁদের দিয়েছেন সম্পত্তির অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা। তিনি বলেন-"নারীরা পুরুষদের সহচর, তারা তাদের মতোই সম্মানিত।" (আবু দাউদ: ২১৩৪)।
"আমি তোমাদের কাছ থেকে নারীদের ব্যাপারে সদাচরণ নেবার অঙ্গীকার নিই।" (মুসলিম)।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও চুক্তির নৈতিকতা:
হুদাইবিয়ার চুক্তি ছিল নবিজির দূরদর্শী কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচায়ক, যা রক্তপাত থামিয়ে মানবতাকে বিজয়ী করেছে। এ চুক্তি যুগ যুগ ধরে পথ দেখাবে। বাহ্যত অনুকূল মনে না হলেও প্রকৃতপক্ষে তা ছিল কল্যাণকর। আল্লাহ বলেন, "তোমরা যা অপছন্দ কর, তাতেই আল্লাহ অনেক কল্যাণ রাখেন।" (সুরা নিসা: ১৯)।

ধর্ম ও রাষ্ট্রের একীভূত রূপ
নবিজির রাষ্ট্রে ধর্ম ও প্রশাসন ছিল একই বৃত্তে দুটি কুসুম। কুরআন ছিল সংবিধান, আর তাঁর চরিত্র ছিল সেই সংবিধানের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। তাঁর আলোকপ্রবাহে ইয়ামান থেকে হাজারামাউত পর্যন্ত এমন শান্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, যেখানে একজন তরুণীও নির্ভয়ে চলাফেরা করত, কেউ চোখ তুলে তাকাত না।

নবি মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজনৈতিক দর্শন শুধু এক দক্ষ শাসকের পরিচয় নয়-এটি এক দীপ্ত নৈতিক সংবিধান, মানবিক নেতৃত্বের আদর্শ ও আল্লাহভীতির ছায়াতলে গড়ে ওঠা এক চিরন্তন সমাজচিত্র। এ দর্শন শুধু মুসলিমদের নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যও প্রাসঙ্গিক। এখানে শাসন মানে সেবা, আইন মানে ইনসাফ আর রাষ্ট্র মানে শান্তির ঘর। যে আদর্শে থবী বদলে যেতে পারে জান্নাততুল্য শান্তিময় আবাসে।

মুহাদ্দিস, জামিয়া ইবনে আব্বাস (রা.) সামান্তপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর সিটি।

আলোকবর্তিকা মুহাম্মদ ﷺ

আর্জিজুল্লাহ ফয়জ আরিব

আলো যখন নিভে যায়, যখন পথের দিশা হারিয়ে যায়– মানুষ তখনই প্রয়োজন অনুভব করে একজন পথপ্রদর্শকের; যিনি আলোর মত স্বচ্ছ, বাতাসের মত কোমল, আবার সাগরের মত গভীর হবেন। এমনই এক মহাপুরুষ ছিলেন আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মদ ﷺ যাঁর জীবন শুধু একটি কিতাব নয়, বরং কোটি মানুষের অন্তরের আলো। রাসুল সা. শুধুই একজন নবি নন, বরং ছিলেন একজন আদর্শ পিতা, বিশ্বস্ত বন্ধু, ন্যায়বান বিচারক ও সাহসী নেতা এবং পরম দয়ালু হৃদয়ের মালিক।

প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের প্রতীক:

নবিজির চরিত্রের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক ছিল তাঁর প্রজ্ঞা ও ধৈর্য। তায়েফের ময়দানে যখন তাঁকে পাথর ছুড়ে রক্তাক্ত করা হয়, তখন ফেরেশতা পাহাড় চাপিয়ে শহরটি ধ্বংস করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তিনি কি প্রতিশোধ নিয়েছিলেন? না, বরং চোখের জলে বলেছিলেন, "হয়তো তাদের পরবর্তী প্রজন্ম আল্লাহর পথে চলবে।" এমন মহত্ত্ব কেবল একজন নবির পক্ষেই সম্ভব।

সত্যবাদিতা ও আমানতদারির প্রতিমূর্তি:

যখন আরবের সমাজে প্রতারণা ও মিথ্যার ছড়াছড়ি, তখন তিনি ছিলেন আল-আমিন। এমনকি তাঁর শত্রুরাও নিজেদের মূল্যবান জিনিস তাঁর হেফাজতে রাখত। আমি যতবার এই গল্প পড়ি, নিজেকে প্রশ্ন করি আমি কি এমন বিশ্বস্ত হতে পেরেছি? নবিজি যেন প্রতিটি চরিত্রে এক জীবন্ত আদর্শ।

ক্ষমার বিরল উদাহরণ:

মক্কা বিজয়ের দিনে, যখন সমস্ত শত্রু তাঁর করায়ত্ত, তখন তিনি তাঁদের বললেন, "আজ তোমাদের প্রতি কোনো প্রতিশোধ নেই, তোমরা মুক্ত।"
এই বাক্যটা বারবার হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে ক্ষমা করে দেওয়ার মতো বড় হৃদয়

ক'জনের থাকে? এই ঘটনা আমাকে শেখায়-ক্ষমাই প্রকৃত শক্তি।

সাধারণ মানুষের প্রতি মমতা:

নবিজি কখনো নিজেকে রাজা ভাবেননি। তিনি মসজিদ নির্মাণে সাহাবিদের সঙ্গে মাটি বহন করেছেন, ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে উপবাস থেকেছেন। একজন খেজুর চাষি হোক বা আরব বেদুইন-প্রতিটি মানুষ তাঁর কাছে ছিলেন সমান স্নেহভাজন। শিশুদের কাঁধে করে নিয়ে হাঁটতেন, বৃদ্ধদের কথা শুনতেন মনোযোগ দিয়ে। এককথায়, তিনি ছিলেন মানুষের অন্তরের নবি।

নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অগ্রদূত:

নারী যখন ছিল অবহেলার পাত্র, তখন তিনি বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।" তিনি কন্যার জন্মে খুশি হয়েছেন, স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছেন, নারীদের শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করেছেন। এই শিক্ষা আজকের সমাজেও কতটা জরুরি, তা আমরা প্রতিনিয়ত টের পাই।

আখলাক ও সিরাত: আমাদের জীবনের দিশা

নবিজি আমাদের এমন এক সিরাত দিয়েছেন, যেটি কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য পথনির্দেশ। তিনি যেমন নিজে নামাজে অশ্রুসিক্ত হতেন, তেমনি মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকতেন। দুনিয়াবি সব দায়িত্বপালনের মাঝেও তিনি ছিলেন সবচেয়ে আল্লাহভীরু। তাঁর একেকটা হাদিস, একেকটা পদক্ষেপ, যেন আমাদের জীবনের জন্য দিকনির্দেশনার বাতিঘর।

আজকের আমার ভাবনা: নবিজির আদর্শ কতটা অনুসরণ করছি?

আমরা আজ মুসলমান বলে পরিচিত হলেও, নবিজির চরিত্র আমাদের জীবনে কতটা প্রতিফলিত হচ্ছে? রাস্তার পাশ দিয়ে কেউ ক্ষুধার্ত গেলে কি আমি ফিরে তাকাই? কারও প্রতি অন্যায় হলে কি প্রতিবাদ করি? পরিবারে কি আমি রহমত হয়ে উঠতে পেরেছি?

আমি জানি, আমি এখনও দুর্বল। কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখি-একদিন নবিজির আদর্শে নিজেকে গড়ব। তিনি যেমন ছিলেন সত্য, ধৈর্য, মমতা, ও ক্ষমার প্রতীক। আমিও চেষ্টা করব তাঁর একটু হলেও অনুকরণ করতে, ইনশাআল্লাহ।

ভালোবাসার ভাষায় নবিজি:

নবিজি আমাদের জন্য শুধু একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর প্রতি ভালোবাসা মানেই নিজের চরিত্রকে সুন্দর করা, নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা। তিনি ছিলেন আল্লাহর 'রহমাতুল লিল আলামিন'-সকল জগতের জন্য রহমত।

আজ আমি, একজন ক্ষুদ্র কলমচি, নবিজির অনুপম চরিত্রের একটুকরো রোশনাই ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। আমার লেখা যদি কারও হৃদয়ে নবিজির প্রতি ভালোবাসা একটু বাড়িয়ে দেয়, তবেই এ কলম সার্থক হবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের নবিজির সিরাত বুঝে তা অনুসরণ করার তাওফিক দিন। আমিন।

নবিজির জীবন: তরুণদের জন্য দিকনির্দেশনা

মো. নূরনবী ইসলাম সুমন

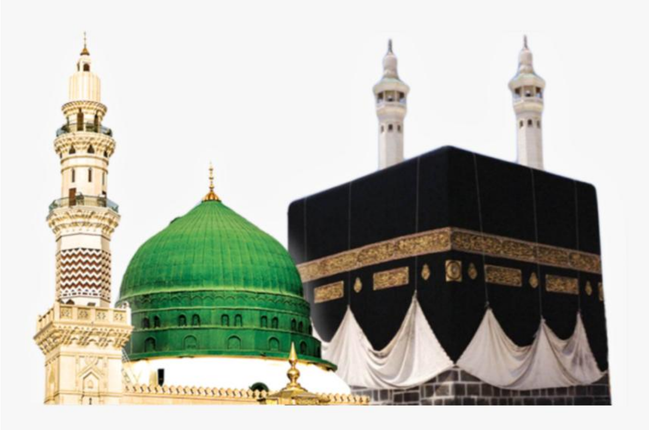

মক্কার এক ধূলিঝড়ের দিনে একটি শিশু জন্ম নেয় এমন এক পরিবারে, যার অভিভাবক তখন অনুপস্থিত। বাবা ইন্তেকাল করেছেন, সন্তান আসার আগেই। মা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছেন তাঁর একমাত্র ছেলের মুখে। নাম রাখা হয় মুহাম্মদ- অর্থাৎ প্রশংসিত। কারও ধারণা ছিল না, এই এতিম শিশুই একদিন বদলে দেবে পুরো দুনিয়ার ইতিহাস।

ছেলেটা খুব শান্ত। কাঁদে না, ঝগড়া করে না। তবু তার জীবনের শুরুটা ছিল অনেক রুক্ষ। ছয় বছর বয়সে মা আমিনা আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে চলে যান। এরপর দাদা আব্দুল মুত্তালিব, যিনি খুব স্নেহ করতেন তাঁকে, তিনিও বেশি দিন বাঁচলেন না। এতিম মুহাম্মদ বড় হতে থাকলেন চাচা আবু তালিবের কাছে।

দারিদ্র্য ছিল নিত্যসঙ্গী। তিনি পাহাড়-প্রান্তরে ছাগল চরাতেন। ছোট বয়সেই জীবনের কঠিন রূপ দেখে ফেলেছিলেন। এক সময় সিরিয়ায় কাফেলার সঙ্গে ব্যবসা করতে যান। সেখানে সততা, ধৈর্য আর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তিনি অন্য ব্যবসায়ীদের থেকে আলাদা হয়ে ওঠেন। মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা এমনভাবে গড়ে ওঠে যে, তাঁকে “আল-আমিন”- অর্থাৎ সবচেয়ে বিশ্বস্ত মানুষ বলা হতো।

তাঁর জীবনে কোনো পাপ ছিল না। এমনকি অন্ধকার যুগেও তিনি মূর্তিপূজা করেননি, মিথ্যা বলেননি, কারও সম্পদে হাত দেননি, কারও নারীকে কুদৃষ্টিতে দেখেননি। তিনি ছিলেন পূর্ণ আত্মসংযমের প্রতীক। যে বয়সে মানুষ বেপরোয়া হয়ে ওঠে, সেই বয়সেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন অন্যদের চোখে নিরাপত্তার প্রতীক।

তাঁর চারিত্রিক দীপ্তিতে মুগ্ধ হয়ে এক সময় ধনী ব্যবসায়ী খাদিজা রা. তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন মুহাম্মদ ﷺ এর বয়স মাত্র ২৫। ঘরজামাই নন, গৃহপ্রতিষ্ঠিত এক পুরুষ, যিনি স্ত্রীকে সম্মান করেন, ভালোবাসেন, সহযোগিতা করেন। এই দাম্পত্যজীবনে ছিল না কোনো দম্ভ, কোনো কর্কশতা, বরং ছিল উদাহরণমূলক ভালোবাসা।

হেরা গুহায় তিনি সময় কাটাতেন ধ্যান ও চিন্তায়। সমাজের অসংগতি তাঁকে কষ্ট দিত। মূর্তিপূজা, কন্যাসন্তানকে জীবন্ত পুঁতে ফেলা, গরিবের প্রতি অবহেলা- এসব অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভেতরে ভিতরে এক আগুন জ্বলছিল। হঠাৎ একদিন, গুহায় তাঁর কাছে ওহি আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। বলা হয়, "পড়ো!" শুরু হয় নবুয়তের দায়িত্ব।

তিনি কারও কাছে নবুয়তের দাবি করেননি জোর করে। প্রথমে স্ত্রী খাদিজা, এরপর আত্মীয়, বন্ধু, আশেপাশের মানুষদের কাছে সত্যের দাওয়াত দিতে থাকেন। মক্কার কুফরি সমাজ তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। তাঁকে তিরস্কার করে, আঘাত করে, সামাজিকভাবে বর্জন করে। কিন্তু তিনি পিছু হটেন না।

এক বৃদ্ধা তাঁর পথে ময়লা ছুড়ে দিতেন। একদিন সেই বৃদ্ধা অসুস্থ হলে নবিজি যান তাঁর খোঁজ নিতে। বৃদ্ধা তখন কাঁদেন। বলেন, “আপনার মতো চরিত্র আমি জীবনে দেখিনি।”

আরেকদিন তায়েফের পথে তিনি যান, দাওয়াত দিতে। শিশু, নারী, পুরুষ সবাই তাঁকে পাথর ছুড়ে তাড়িয়ে দেয়। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় বসে পড়েন, মাথা নিচু করে বলেন, “হে আল্লাহ! তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করো, তবে এই মানুষদের আমি ক্ষমা করে দিই।”

তারপর যখন তিনি মদিনায় চলে যান, তখন তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে একটি আদর্শ সমাজ। সেখানে ছিল মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান, মুশরিক- সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পদের নিরাপত্তা, সামাজিক সহাবস্থান।

তাঁর ব্যক্তিত্ব এত উদার ও সুন্দর ছিল যে, যাঁরা একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তাঁকে ভালো না বেসে পারতেন না। সাহাবিরা বলতেন, “আমরা তাঁর মুখের দিকে ঠিকভাবে

তাকাতেও পারতাম না। মনে হতো চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি।"

তিনি শুধু মসজিদে নামাজ পড়াতেন না। রাস্তা ঝাড়ু দিতেন, অভুক্তকে খাওয়াতেন, অসুস্থকে দেখতে যেতেন, বিচার করতেন, যুদ্ধ করতেন, শিশুদের মাথায় হাত রাখতেন। তিনি ছিলেন নেতা, শিক্ষক, কৌশলী প্রশাসক, স্বামী, বন্ধু- সবকিছুতেই সফল ও শ্রেষ্ঠ।

একদিন এক সাহাবি এসে বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি চাই জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে।" নবিজি বললেন, "তবে তুমি সেজদার সংখ্যা বাড়িয়ে দাও।" এটিই তাঁর শিক্ষাদান। কাউকে তিরস্কার না করে সঠিক পথে ডাকতেন।

উহুদের যুদ্ধে তাঁর দাঁত ভেঙে যায়, মাথা ফেটে যায়। কেউ বলে, "দোয়া করুন, এদের ধ্বংস হয়ে যাক।" তিনি বলেন, "না, আমি অভিশাপ দিতে আসিনি, আমি রহমত হয়ে এসেছি।"

তাঁর জীবনে কখনো বিলাসিতা ছিল না। ঘরে একাধিক দিন চুলা জ্বলত না। তিনি খেজুর খেয়ে কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু চুরি করলে তাঁর প্রিয় কন্যা ফাতিমাও যদি হতেন, তবে তাঁর হাত কেটে দিতেন- এই ছিল ন্যায়ের প্রতি তাঁর অটল দৃঢ়তা।

তাঁর সাহচর্যে সাহাবিরা হয়ে ওঠে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানুষ। এক সাহাবি বলেছিলেন, "আমরা যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে থাকতাম, মনে হতো জান্নাত আমাদের সামনে।"

তরুণদের তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। হজরত আলি রা. ছিলেন তাঁর প্রথম শিশু মুসলমান। হজরত উসামা ইবনে যায়েদ মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশাল বাহিনীর সেনাপতি। হজরত জুবায়ের, হজরত তলহা, হজরত মুয়াজ- এঁরা সবাই ছিলেন তরুণ, যাঁরা জীবন দিয়েছিলেন রাসুলের একডাকে।

তাঁর জীবনে জিহাদ মানে কেবল যুদ্ধ নয়- জিহাদ মানে আত্মসংযম, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান, মানুষের অধিকার আদায়ে সংগ্রাম। তিনি কখনো আগ্রাসন করেননি, বরং প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ করেছেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি তিনি মেনে নেন নিজের দুঃখের বিনিময়ে, কিন্তু তা পরিণত হয় ইসলামের এক মহা বিজয়ে। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কৌশল ও ধৈর্য কখনো কখনো তলোয়ারের চেয়েও শক্তিশালী।

তাঁর মৃত্যু হয় এমন অবস্থায়, যখন তাঁর ঘরে আগুন ছিল না। এক টুকরো রুটি আর পানি দিয়ে তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন, অথচ চাইলে তিনি বিলাসে ভেসে যেতে পারতেন।

তাঁর রেখে যাওয়া উত্তরাধিকার ছিল- কুরআন, সুন্নাহ, আর তাঁর অনুকরণীয় জীবন। তিনি বিদায় হজের ভাষণে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যারাই আছে, তারা যেন অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেয়।"

আজকের তরুণদের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছাতে হলে, আমাদের কলমে, আমাদের কণ্ঠে, আমাদের আচার-আচরণে তাঁর সুন্নাহ জাগ্রত করতে হবে।

এই সময়ের তরুণদের হতাশা, ব্যর্থ প্রেম, সামাজিক চাপ, আত্মঘাতী চিন্তা- সবকিছুর মাঝে নবিজির জীবন হয়ে উঠতে পারে বেঁচে থাকার ঠিকানা।

যার জীবনে আল্লাহর ভয় থাকবে, রাসুলের ভালোবাসা থাকবে- সে কখনো অন্যায় করতে পারে না, হীনম্মন্যতায় ভুগে না, আত্মসম্মান বিসর্জন দেয় না।

লেখক, কবি ও প্রাবন্ধিক

সিরাত: অনুপম জীবন পাঠ্য

মাহমুদ হাসান ফাহিম

রাসুল সা. এর জীবনী শুধু নবীপ্রেমীদের প্রিয় প্রসঙ্গই নয় বরং মুমিনের জীবনের প্রিয় পাঠ ও পাঠ্যও বটে। প্রেরণার মিষ্টি মিষ্টি অনুভব এর পাতায় পাতায়। ভালোবাসার আলতো পরশ এর বাক্যে বাক্যে। পাঠ জুড়ে হৃদয় শান্তির উপায় উপকরণ। বছরের নির্দিষ্ট কোনো সময়ে নয় বরং প্রকৃত আশেকে রাসুলরা নিজেদের পাঠ তালিকায় সবসময়ই প্রথমে রাখেন সিরাত প্রসঙ্গ।

সিরাত কী?

সিরাত বলতে প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সা. এর জীবনীকে বোঝায়। সিরাত হলো, প্রিয় নবির জীবন, বা জীবনী, তাঁর জন্ম, তাঁর বৈচিত্রময় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা, আচার-আচরণ, বৈশিষ্ট্য-এককথায় তাঁর যাপিত জীবনের আদর্শ। আধুনিক ব্যবহারে যাকে জীবনবৃত্তান্ত বলা হয়।

সিরাত পাঠের উপকারিতা:

হাকিমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হজরত মাওলানা আশরাফ আলি থানভি রহ. সিরাত পাঠের উপকারিতা বর্ণনা করে লিখেন, সিরাত অধ্যয়নের দ্বারা নিজের নবি সা. এর ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিচিতি লাভ হয়। আর এ পরিচিতির মাধ্যমে অনিবার্যভাবে সৃষ্টি হয় প্রিয় নবির প্রতি ভালোবাসা। যার সত্য প্রতিশ্রুতিতে লাভ হবে জান্নাতে তাঁর সঙ্গ ও সান্নিধ্য। আর এটা যে এক মহা নিয়ামত তাতে কি কারও দ্বিমত আছে? (ভূমিকা, বাণী অংশ, সিরাতে মুস্তফা হজরত মাওলানা ইদরিস কান্ধলভী)

সিরাত কেন পড়ব?

আমাদের জন্য রাসুল সা. সিরাত অধ্যয়ন শুধু জ্ঞানবৃদ্ধির বিষয়ই নয়, এটা আমাদের দ্বীনি প্রয়োজন। কেননা মানবজীবনের এমন কোনো দিক নেই, যা প্রিয়নবি সা. কে স্পর্শ করেনি। ব্যাবহারিক, আধ্যাত্মিক, ইহকালীন, পরকালীন সব কিছুই তাঁর জীবন ও সাধনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। ফলে তাঁর জীবনাদর্শ মানবজাতির জন্য অনুপম আদর্শ। জীবন-পথে আলোর মশাল ও চূড়ান্ত দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'অবশ্যই রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে অনুপম আদর্শ (এমন ব্যক্তির জন্য) যে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।' (সুরা আহযাব : ২১)

দৃঢ় ঈমানের সোনালি সোপান :

পবিত্র সিরাত পাঠের অনন্য প্রাপ্তি হচ্ছে ঈমান বৃদ্ধি। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ইতিহাস সাক্ষী যে, পবিত্র সিরাত যুগে যুগে অসংখ্য মানুষকে ঈমানের পথ দেখিয়েছে। নবি সা. এর ওপর নাজিল হওয়া কুরআন, যার আলোয় উদ্ভাসিত তাঁর বাস্তব জীবন, তাঁর অনন্য চরিত্র মাধুর্য, তাঁর মহত্ত্ব, মহানুভবতা যুগে যুগে অসংখ্য মানুষকে ঈমান ও বিশ্বাসের স্নিগ্ধ ছায়াতলে নিয়ে এসেছে। তাঁর পবিত্র জীবন তাঁর নবুয়ত ও রিসালাতের দীপ্যমান প্রমাণ, যার প্রভাব কোনো ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয় ও মস্তিষ্ক এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই তাঁর পবিত্র জীবন ও কর্ম ঈমানের আলো বঞ্চিত প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ মানবের ঈমান লাভের মাধ্যম আর ঈমানের আলোপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবান মানবের ঈমান বৃদ্ধির উপকরণ।

বাহ্যিক সৌন্দর্য লাভ:

সভ্য, ভদ্র ও সুন্দর মানুষ হতে চাইলে বাহ্যত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুসজ্জিত করা অপরিহার্য। অন্যান্য গুণাবলি যতই উচ্চমানের হোক না কেন, যদি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিপাটি না হয়, তবে সে মানুষ কখনোই সভ্যজনদের মধ্যে গণ্য হয় না। এর জন্য চাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিচর্যা তথা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। চুল, দাড়ি নখ ইত্যাদির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। সেইসঙ্গে মার্জিত পোশাক-আশাকও এর অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

পরিশুদ্ধ আত্মার দীপ্তি:

বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চেয়ে মানুষের হৃদয়জগৎ বেশি মূল্যবান। এটাই তার প্রকৃত সত্তা, বহু গুণের লালন ক্ষেত্র ও বিপুল সম্ভাবনার বিচিত্র ভুবন। এখানে চাষবাস করে যথার্থ পরিচর্যা করলে মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে। আবার

অবহেলার ফলে এখানে এত আগাছা ও পশুবৃত্তি জন্ম নেয়, যা মানুষকে পরিণত করে হিংস্রতম হায়েনা। নবি জীবনের প্রকৃত শিক্ষা কেউ তার ভেতরে ঢোকাতে পারলে সে কখনো এরূপ হিংস্র বা হায়েনা হতে পারে না।

মানবতার শিক্ষা:

মানুষের জীবনে মানবতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মাঝে মানবতা নেই সে কারও উপকারে আসে না। প্রিয়নবি সা. এর জীবন থেকে আমরা মৌলিকভাবে মানবতার শিক্ষাই পাই। জাহেলিয়াতের নিকষ অন্ধকার যখন পৃথিবীকে গ্রাস করতে বসেছিল, সেই চরম দুর্দিনে হিদায়াত ও সংস্কারের এক আলোকবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন তিনি। হেরার আলোকরশ্মি দিয়ে মহান এক সভ্যতা বিশ্বের মানুষকে শিখিয়েছেন। মানবতাকে বাঁচিয়ে রাখতে সমাজের সকল পর্যায়ে মানবাধিকারের এমন এক নমুনা পেশ করেন, যা আজও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে গোটা বিশ্বের কাছে অনন্য হিসেবে স্বীকৃত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নিঃসন্দেহে নবি সা. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তাঁর মধ্যে মানবিক সকল বৈশিষ্ট্য পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। মহান আল্লাহ তাঁকে নিজ অসীম জ্ঞানের ভান্ডার থেকে দান করেছেন জ্ঞানের আধার।' (সুরা নামল : ৬)

আমলের যাচাই নিক্তি:

আমরা যে কাজগুলো করি, সেগুলো রবের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট কিনা এবং তা আমাদের পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনবে কিনা তার যাচাইয়ের জন্য একমাত্র মাধ্যম হলো নবি জীবন। প্রিয়নবি সা. তার যাপিত জীবনে আমাদের জন্য আদর্শ রেখে গেছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর আনুগত্যের সাথে সাথে প্রিয় নবিজির আনুগত্যের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'রাসুল তোমাদের যা করতে বলেন তা করো, আর যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাকো এবং আল্লাহকে ভয় করে চলো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (সুরা হাশর: ০৭)

রাসুল সা. এর নির্দেশগুলোও কুরআনের নির্দেশের ন্যায় অবশ্য পালনীয়। অনেক সাহাবি আয়াতের ব্যাপক অর্থ অবলম্বন করে রাসুল সা. এর প্রত্যেকটি নির্দেশ কুরআনের নির্দেশের অনুরূপ অবশ্য পালনীয় সাব্যস্ত করেছেন। (তাফসিরে মাআ'রেফুল কুরআন ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)
সুতরাং আমরা যদি তাঁর উত্তম আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর বাতলানো পদ্ধতিতে আমল করতে পারি তাহলে তা-ই হবে আমাদের নাজাতের ওসিলা।

নবি জীবনী মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তির সমীরণ বয়ে আনে। হৃদয়ের উত্তাপ কমে যায়। নবিপ্রেমের ব্যথা বেদনা বাড়ে এবং প্রকৃত প্রেমিক তাঁর গুণ-সম্বলিত বর্ণনায় সদাই প্রাণবন্ত থাকে। রাসুল সা. এর জীবনী পাঠে মানুষ পায় শান্তির ঠিকানা। সিরাত পাঠ করে বহু অমুসলিম মুসলমান হয়েছে। সিরাতের মাঝে রয়েছে এক অপার্থিব আনন্দ আর আকর্ষণবোধ। তাই প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য হলো, সিরাত অধ্যয়ন করা। দৈনন্দিনের পাঠে একটি অংশ যেন সিরাত বিষয়ক কোনো গ্রন্থ থাকে। তাহলে রাসুলের ভালোবাসা আমাদের হৃদয় মন আলোকিত করবে।

লেখক: মাদরাসা শিক্ষক, টঙ্গী গাজীপুর

সিরাতের আলোকে তারুণ্যের দিকনির্দেশনা

মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আল মাহমুদী (কাশিয়ানী)

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো মানুষ নেই, যিনি মুহাম্মাদ সা.-এর মতো সার্বজনীন, পরিপূর্ণ এবং চূড়ান্ত আদর্শ হয়ে উঠেছেন। তাঁর জীবন ইতিহাস নয়, বরং এক জীবন্ত আলো, যা যুগে যুগে দিগ্‌ভ্রান্ত জাতিকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছে। আর আজকের তারুণ্য-যারা ভবিষ্যতের নেতৃত্বের দাবিদার, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবন অনুসরণ করা শুধু প্রশংসনীয় নয়, বরং আবশ্যক।

নবিজিকে ভালোবাসা: ঈমানের অঙ্গ

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তানসন্ততি এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে উঠি।" (বুখারি: ১৫)

এই হাদিস প্রমাণ করে, নবিজিকে ভালোবাসা কেবল আবেগ নয়; এটি ঈমানের অপরিহার্য শর্ত। তরুণ প্রজন্মকে এই ভালোবাসার বীজ বপন করতে হবে হৃদয়ের গভীরে। ভালোবাসা মানে কেবল তাঁর জীবনের গল্প শোনা নয়; বরং তাঁর আদর্শকে জীবনে বাস্তবায়ন করা।

ইতিহাসের নির্ভুল দলিল: সিরাতে নববি

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিশ্বের কোনো ব্যক্তিত্বের জীবনী এত নির্ভুল, পূর্ণাঙ্গ ও গবেষণাসমৃদ্ধভাবে সংরক্ষিত হয়নি।
হজরত মোহাম্মদ সা. এর জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যুর প্রতিটি পর্ব-হিজরত, বদর-উহুদের যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, মদিনার রাষ্ট্র পরিচালনা-সবই ইতিহাসের নির্ভুল দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত।

ইমাম ইবনে হিশাম, ইমাম যাহাবী, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মহামনীষীরা বিশাল সিরাতগ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা শিবলী নোমানী তাঁর "সীরাতুনববী"তে এমন একটি উক্তি করেছেন যা আমাদের ভাবনার খোরাক দেয়;
"যদি আদর্শ মানব খুঁজতে হয়, তবে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চেয়ে উত্তম কাউকে কখনোই পাবে না এই পৃথিবী।"

তরুণদের জন্য দিকনির্দেশনা: আলোকবর্তিকা নবিজি ﷺ

বর্তমান তারুণ্য নানা সংকট, বিভ্রান্তি ও বিভাজনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। পশ্চিমা অপসংস্কৃতি, ধর্মহীন জীবনধারা এবং প্রযুক্তির দাসত্ব-এইসবই তাদের নৈতিকভাবে ধ্বংস করছে। এই সময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সিরাতই হতে পারে তাদের জন্য একমাত্র মুক্তির পথ।

১. ব্যক্তিত্ব গঠনে সিরাত

তরুণদের চরিত্রে যদি সততা, ন্যায়পরায়ণতা, নম্রতা ও দয়ার গুণাবলি চাই, তবে রাসুলুল্লাহ ﷺএর চরিত্র অনুসরণই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন:

"আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণাঙ্গ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।"

- (মুসনাদে আহমাদ)

২. নেতৃত্ব ও উদ্যমে নবিজি ﷺ

যুবক বয়সে নবিজি ﷺ ছিলেন 'আল-আমিন' নামে খ্যাত। ব্যবসা, সমাজ, দ্বীন-সবক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দিয়েছেন অসাধারণ দক্ষতায়। বর্তমান যুব সমাজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও লক্ষ্যভেদী দৃষ্টিভঙ্গি গড়তে হলে তাঁর জীবনের নেতৃত্বদায়ী দিকগুলো অধ্যয়ন ও অনুসরণ অপরিহার্য।

৩. আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সিরাত

যুবক বয়সেই তাহাজ্জুদের অভ্যাস, কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা, দুস্থদের জন্য দয়ালু মন, এগুলোই নবিজির ﷺ তরুণ জীবনের বৈশিষ্ট্য। আজকের যুবকের উচিত-নিজেকে গড়ার জন্য এমন আধ্যাত্মিক সফর শুরু করা।

ভালোবাসা থেকে অনুসরণ-অনুসরণ থেকে উত্তরণ

নবিজিকে ﷺ ভালোবাসা মানেই তাঁর পথ অনুসরণ করা। হজরত আনাস (রা.) বলেন:

"রাসুলুল্লাহ ﷺএর চেয়ে অধিক সুন্দর চরিত্র আমি আর কারও মাঝে দেখিনি।"

- (বুখারি, মুসলিম)

আজকের সমাজে এই সুন্দর চরিত্রেরই অভাব। তাই তরুণদের উচিত-তাঁর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় অধ্যয়ন করা, তাঁর আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করে জীবনে রূপান্তর ঘটানো। তবেই নবিজির প্রতি আমাদের ভালোবাসা পূর্ণতা পাবে, ঈমান হবে পরিপূর্ণ, জীবন হবে শান্তিময়।

নবিজি মুহাম্মাদ ﷺএর সিরাত কেবল ইতিহাস নয়, বরং আলোর দিশারি। তরুণদের জন্য এই আলো একমাত্র নিরাপদ পথ দেখাতে পারে। আজকের যুবসমাজ যদি তাঁর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর অনুসরণে জীবন গড়তে চায়, তাহলে ভবিষ্যৎ হবে আলোকিত, সমাজ হবে কল্যাণময় এবং জাতি পাবে সত্যিকারের নেতৃত্ব।

আল্লাহ আমাদের সকল তরুণ-তরুণীকে নবিজি ﷺএর জীবনাদর্শ ভালোবাসার তাওফিক দান করুন এবং তা বাস্তব জীবনে অনুসরণের যোগ্যতা দান করুন-আমিন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক

সজীব মাহমুদ

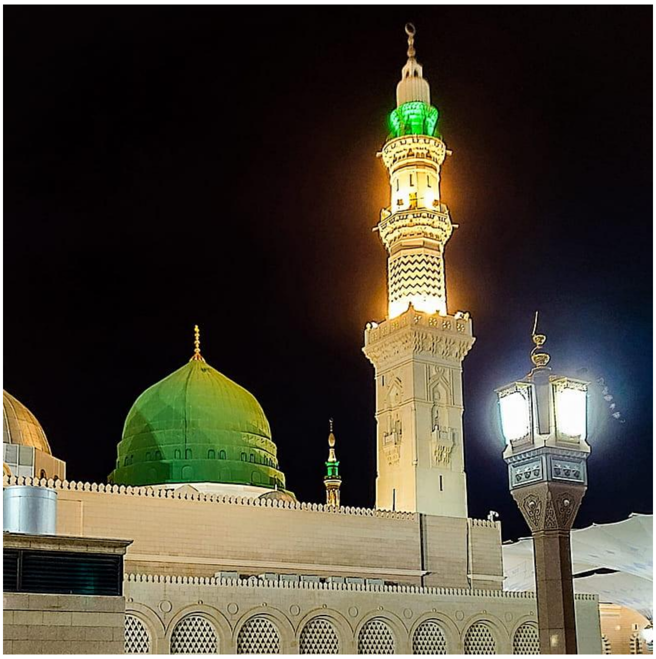

আধুনিকতার ছোঁয়ায় বদলে যাচ্ছে পৃথিবী । প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতি , তথ্যের সহজলভ্যতা এবং বৈশ্বিক যোগাযোগের মুক্ত দ্বার - এসব মিলিয়ে আজকের তরুণ সমাজ এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে । কিন্তু এই আলো ঝলমলে দৃশ্যপটের অন্তরালে রয়েছে এক অদৃশ্য অন্ধকার। নৈতিক অবক্ষয় , আত্মিক দীনতা ও মূল্যবোধহীনতার গভীর খাদ । এই সংকটকালে তারুণ্য যেন এক দিশাহারা নাবিক , যার প্রয়োজন একজন আদর্শ নাবিক পথপ্রদর্শক । আর এই দিশারি হচ্ছেন, বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত , সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক, আমাদের প্রিয়নবি, রাসুলুল্লাহ সা.।

তাঁর জীবন (সিরাত) শুধু একটি ঐতিহাসিক জীবনী নয় , বরং এক জীবন্ত আদর্শ । তরুণদের জন্য এটি একটি আলোকবর্তিকা , যা দিশাহীনতার অন্ধকারে পথ দেখায় । যে জাতির যুবক সিরাতুন্নবির আলোয় আলোকিত , সে জাতির ভবিষ্যৎ কখনোই অন্ধকার হতে পারে না ।

১. সততা ও আমানতদারিত্বের অনুপম দৃষ্টান্ত :

রাসুলুল্লাহ ﷺ তরুণ বয়সেই সমাজে পরিচিত ছিলেন 'আল-আমিন' নামে। যার অর্থ, সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি । এই উপাধি তিনি অর্জন করেছিলেন অসাধারণ সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও আমানত রক্ষা করার গুণে । ব্যবসা হোক কিংবা পারিবারিক সম্পর্ক, নবিজি ﷺ কখনো প্রতারণা করেননি , কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করেননি ।

আজকের তরুণ যদি এই গুণকে ধারণ করে - শুধু নিজের জীবনে নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও এক ইতিবাচক পরিবর্তন সম্ভব। কারণ, একটি সৎ চরিত্র গঠনের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় আদর্শ নেতৃত্ব ও সুশাসন ।

২. আত্মশুদ্ধি ও সংযমের শিক্ষা :

মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার নিজের ভেতরের লোভ , হিংসা , অহংকার ও জিহ্বার লাগামহীনতা । রাসুলুল্লাহ ﷺ আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে এইসব অপশক্তিকে পরাজিত করেছিলেন । তাইফের জঘন্য নির্যাতনের পরও তিনি অভিশাপ নয়, বরং দোয়া করেছিলেন । উহুদের যুদ্ধে নিজের রক্তে ভিজে গিয়েছিলেন , তবুও প্রতিশোধ নয়, তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করেছিলেন । ক্ষমাই তো ইসলামের অনন্য আদর্শ।

এই সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা যদি আমাদের তারুণ্য গ্রহণ করে , তাহলে তারা হতাশা , রাগ, হতভাগ্য প্রেম কিংবা সামাজিক অবিচার - কোনো কিছুতেই ভেঙে পড়বে না।

৩. জ্ঞান, চিন্তা ও আত্মমগ্নতার অনন্য দৃষ্টান্ত :

রাসুলুল্লাহ ﷺ পয়গম্বর হওয়ার আগেই হেরা গুহায় নির্জনে ধ্যানে মগ্ন থাকতেন । এই ধ্যান ছিল আত্মজিজ্ঞাসা , ভাবনা ও আত্ম-অন্বেষণের প্রতীক। তিনি চিন্তা করতেন , সমাজের অনাচার, কুসংস্কার ও অবিচারের কারণ কী ? কীভাবে মানুষকে মুক্ত করা যায় ?

তরুণদের উচিত অন্তর থেকে আত্মজিজ্ঞাসা শুরু করা - " আমি কে ? ", " কেন পৃথিবীতে এসেছি ? ", " আমার জীবনের উদ্দেশ্য কী ? " এইসব প্রশ্নই একজন তরুণকে গড়তে পারে নৈতিকভাবে দৃঢ়, চিন্তাশীল ও সৃজনশীল একজন মানুষ হিসেবে ।

৪. নেতৃত্ব ও সাহসিকতার শিক্ষা :

নবিজি ﷺ যুদ্ধের ময়দানে যেমন সাহসী ছিলেন , তেমনি দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি সিদ্ধান্তেও ছিলেন দৃঢ়চেতা । বদর, ওহুদ কিংবা হুনাইন - প্রতিটি যুদ্ধে তিনি তরুণ সাহাবিদের

কাঁধে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিয়েছেন । হজরত আলি রা., যিনি তরুণ বয়সেই খাইবারের দুর্গ জয় করেন , তার মধ্য দিয়েই নবিজির তরুণদের উপর আস্থার প্রকাশ পাওয়া যায় ।

আজকের বাংলাদেশেও যদি তরুণরা নিজেদের দায়িত্ববান ও সাহসী করে গড়ে তোলে , তাহলে আমাদের সমাজে দুর্নীতি, অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি সত্যিকার বিপ্লব ঘটানো সম্ভব ।

৫. দয়ালু মনোভাব ও শিষ্ট আচরণের আদর্শ :
নবিজি ﷺ ছিলেন 'রহমাতুল লিল আলামিন'-সার্বজনীন করুণা । তিনি কখনো কাউকে তুচ্ছ করেননি , গালি দেননি , এমনকি তার সবচেয়ে বড় শত্রুকেও দোয়া করেছেন । শিশুর প্রতি , নারীর প্রতি , অশ্রদ্ধেয় জাতির প্রতিও তিনি ভালোবাসা , সম্মান ও দয়ালু আচরণ দেখিয়েছেন ।

তিনি বলেছেন,
" তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম। " (সহিহ বুখারি)

তরুণ বয়সেই যদি কেউ এই গুণ অর্জন করে , তাহলে সে হবে সমাজের এক আশীর্বাদস্বরূপ মানুষ , যার চারপাশ আলোকিত হবে সদাচরণে ।

বাস্তব জীবনে সিরাতের প্রাসঙ্গিকতা :
আজকের সমাজে তরুণরা হয় হতাশার শিকার , নয়তো ভোগবাদ ও স্বার্থপরতার ফাঁদে বন্দি । তাদের অনেকে ভুল পথ বেছে নেয় , কারণ তারা জানে না একটি বিকল্প , নৈতিক , অর্থবোধক জীবনের রূপরেখা কেমন হতে পারে ।

সিরাতুন্নবি ﷺ আমাদের শেখায় -
কীভাবে সীমাবদ্ধতার মাঝেও আলোকিত থাকা যায়। কীভাবে সমাজের বিরুদ্ধ স্রোতের মধ্যেও সততার দীপ্তি ধরে রাখা যায়। কীভাবে ভালোবাসা, দয়া ও চরিত্র দিয়ে জয় করা যায় একটি জাতিকে। এই শিক্ষা কেবল ইসলামিক ইতিহাসের নয় , বরং প্রতিটি তরুণের আত্মোন্নয়নের পথনির্দেশক ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনী তরুণদের জন্য একটি বাস্তব মানচিত্র । যেখানে প্রতিটি বাঁক , প্রতিটি ঘটনা একেকটি শিক্ষা । তিনি ছিলেন শিক্ষক , যোদ্ধা , নেতা, বাবা, স্বামী, বন্ধু। সবমিলিয়ে একটি পরিপূর্ণ চরিত্র । তাঁর জীবন এমন একটি দর্পণ , যেখানে তরুণরা নিজেদের প্রতিফলন খুঁজে পেতে পারে ।

আজ প্রয়োজন, সেই জীবনকে জানা, বোঝা ও ভালোবাসার । কারণ , সিরাতুন্নবি ﷺ শুধু ইসলামি দীক্ষার কেন্দ্র নয় , বরং মানবিকতার চূড়ান্ত আদর্শ। সেই আদর্শ যদি আমাদের তারুণ্য গ্রহণ করে , তাহলে ভবিষ্যৎ হবে আলোকোজ্জ্বল , সুবিন্যস্ত ও মানবিক ।

তাই আসুন, সিরাতকে জীবনের রক্তধারায় ধারণ করি । তরুণ প্রজন্মের হৃদয়ে নবিজির ভালোবাসার আলো জ্বালিয়ে, আমরা গড়ে তুলি এক সুন্দর আগামীর পৃথিবী। যেখানে সততা থাকবে, ভালোবাসা থাকবে, আর থাকবে মানবতার জয়গান । ইনশাআল্লাহ ।

সুনামগঞ্জ , সিলেট

সিরাতের আলোয় তারুণ্যের দিশা

মাহফুজ উল্লাহ তৈয়ব

যখন তরুণ হৃদয় আঁধারঘেরা জগতে দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন প্রয়োজন হয় এমন এক আলোর, যা শুধু চোখ নয়, আত্মাকেও আলোকিত করে। এ আলো আর কেউ নন, তিনিই হজরত মুহাম্মদ সা.। যাঁর জীবন ছিল কেবল একটি ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা নয়, বরং একটি জীবন্ত কুরআন। এক অনন্ত দিশা, অনুকরণযোগ্য আদর্শের এক মহাজীবন।

আজকের তরুণদের হাতে থাকার কথা ছিল কুরআন, হৃদয়ে তাকওয়া, চোখে স্বপ্ন। অথচ তারা আজ দিগ্‌ভ্রান্ত, বিভ্রান্ত এবং কৃত্রিমতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন। যাদের সামনে ছিল সিরাতের সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা, তারা আজ ইউটিউব ও ইনস্টাগ্রামের স্ক্রলে বুঁদ হয়ে পথ হারাচ্ছে। তারা পড়ে ফ্যান্টাসি উপন্যাস, ফলো করে সিনে-তারকা, অথচ রাসুল সা. এর জীবনী তাদের জীবনে নতুন কিছু নয়, বরং এক জীবন্ত বাস্তবতা।

রাসুলুল্লাহ সা. মানবতার শ্রেষ্ঠ রোল মডেল:

আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।"(সুরা আহযাব:২১)
এই আয়াতের আলোকে যদি তরুণ সমাজ নিজেকে যাচাই করে, তবে তারা বুঝতে পারবে রাসুল সা. কেবল নামাজ-রোজার আহ্বানকারী নন, বরং তিনি ছিলেন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার শিক্ষক, মানবমনের পূর্ণাঙ্গ রূপকার।
তিনি ছিলেন সেই আদর্শ মানুষ, যাঁর চরিত্রে একসঙ্গে মিলেছিল কোমলতা ও কঠোরতা, ভালোবাসা ও শৃঙ্খলা, দয়া ও দৃঢ়তা, চিন্তা ও কর্ম সবকিছু এত নিখুঁতভাবে, যেন একজন তরুণ যদি তাঁকে অনুসরণ করে, তবে তার জীবনে ব্যর্থতার কোনো স্থানই থাকবে না।

সাহাবিরা সিরাতের জীবন্ত ফসল:

আজ যদি কোনো যুবক ভাবে, "আমার বয়স তো কম, আমি এখনও গুনাহে একটু ঢুকতেই পারি" তবে সে যেন একবার ভাবে, হজরত আলি রাযি. অল্প বয়সে কীভাবে নবিজির বিছানায় শুয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।
তাঁর সমসাময়িক হজরত মুসআব ইবনে উমাইর রাযি. ছিলেন মক্কার সবচেয়ে শৌখিন, বিলাসবহুল জীবনধারার তরুণ। কিন্তু তিনি সেই জীবন ছেড়ে দিয়ে রাসুলের আহ্বানে নিজের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন। বদরের ময়দানে তিনি শহিদ হন, অথচ মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ঢেকে দেওয়ার মতো পর্যন্ত কাপড় ছিল না।

এরা ছিলেন এমন তরুণ, যাদের জীবন ছিল সিরাতের বাস্তবায়ন। যারা রাসুল সা. এর প্রতি এতটাই প্রেমমুগ্ধ ছিল যে, তাঁর হুকুমের তুলনায় দুনিয়ার সব কিছুই তাদের কাছে তুচ্ছ ছিল।

আজকের তরুণ সমাজ:

আজকের তরুণ সমাজের প্রেম আইডলকে ঘিরে, অথচ সেই আইডল কোনো ফুটবল খেলোয়াড়, কোনো মডেল, কিংবা কোনো ইউটিউবার। তারা রোনালদোর গোল উদ্‌যাপন কপি করে, অথচ রাসুল সা. এর সুন্নাহর কোনো বিষয় জানে না। ফ্যাশনের নামে অর্ধনগ্নতাকে সংস্কৃতি মনে করে, অথচ হজরত উসমান রাযি. এর লজ্জাশীলতা তাদের কাছে অজানা।

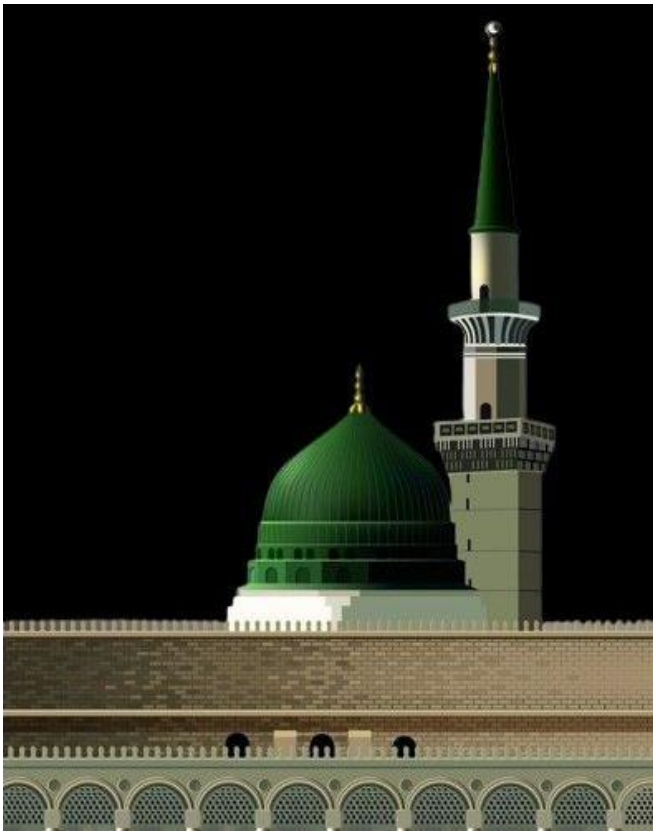

এই তারুণ্য সিরাতকে জানে না, মানে না, চর্চা তো দূরের কথা, পড়তেও চায় না। অথচ এরাই রাতভর সিরিজ দেখে, অশ্লীলতা দেখে, ধর্ম নিয়ে বিদ্রুপ করে, কার্টুন দেখে, কিন্তু একবার কুরআনের আয়াত বা নবির কথা শুনলেই হাঁপিয়ে ওঠে।

সিরাত গবেষণায় পশ্চিমাদের ইসলাম গ্রহণ: সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে বহু অমুসলিম গবেষক সিরাত এবং

কুরআনের আলোকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য;

১. ড . মরিস বুকাইলি (Dr. Maurice Bucaille)

যিনি ফারাও এর মমির গবেষণার মাধ্যমে কুরআনের ঐতিহাসিক নির্ভুলতা দেখতে পান। এরপর তিনি বলেন "The Quran is in complete harmony with modern science."

তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার বিখ্যাত বই "The Bible, the QurÕan and Science" বিশ্বজুড়ে আলোড়ন তোলে।

২. ড. জেফরি ল্যাঙ্গ (Dr. Jeffrey Lang)

একজন মার্কিন গণিতবিদ, যিনি একজন নাস্তিক ছিলেন। এক মুসলিম ছাত্রের দেওয়া কুরআন ও সিরাতগ্রন্থ পড়ে তিনি নিজের জীবনবোধ পালটে ফেলেন এবং বলেন:

"Islam gave me the answers I couldn't find in any other system."

৩. প্রফেসর কিথ এলো মুর (Prof. Keith L. Moore)

মানব ভ্রূণ বিজ্ঞানের ওপর কাজ করার সময় তিনি কুরআনের ভ্রূণ বিকাশের যে বিবরণ দেখেন, তাতে বিস্ময়ে অভিভূত হন। তিনি বলেন,

"Muhammad sal.could not have known this in the 7th century unless it was revealed by God."

বৈজ্ঞানিকদের চোখে, তারুণ্যের দিশাপ্রত্যক্ষ করেছিল। পরবর্তী সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের পর্যবেক্ষকরাও এ দৃশ্য দেখেছে বলে ঐতিহাসিক বর্ণনায় আছে।

মোজেযা:

কাফিররা একদিন রাসুল সা. কে বলেছিল "তুমি যদি সত্য নবি হও, তবে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করো!" তিনি আঙুলের ইশারায় চাঁদকেই টুকরো করেন।

NASA এর লুনার এক্সপ্লোরেশন ও চাঁদের ফাটল (Rilles) নিয়ে গবেষণা প্রমাণ করে যে, চাঁদে অতীতে একবার বড় ধরনের বিভাজন ঘটেছিল। যদিও বিজ্ঞানীরা এর ব্যাখ্যা খুঁজে পান না, কিন্তু মুমিন হৃদয় তো জানে, এই ছিল রাসুল সা. এর একটি জীবন্ত মোজেযা।

আজকের তরুণ এক নীরব আত্মহননের দিকে:

আজকের তরুণরা গর্ব করে বলে, "আমি নাস্তিক, আমি যুক্তিবাদী, আমি মুক্ত চিন্তাশীল!" কিন্তু এই চিন্তা তাদেরকে শান্তি দিয়েছে কি? আত্মা খুঁজে পেয়েছে স্ফুরণ? তারা ডুবে গেছে হতাশায়, বিষণ্নতায়, আত্মহননের চিন্তায়। তারা গান শোনে, মাদক নেয়, সম্পর্ক গড়ে, তারপরেও চিরস্থায়ী সুখ পায় না। কেন?

কারণ তারা জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানে না, জীবনদাতা আল্লাহকে চেনে না, আর যে রাসুল সা. এর মাধ্যমে সেই দিশা এসেছে তাকে তারা জীবনের "রোল মডেল" হিসেবে মানে না।

হে তরুণ!

ফিরে এসো সিরাতের ছায়ায়, তোমার জীবনে যত সমস্যা, যত অন্ধকার, সবকিছুর উত্তরে আছে একটি নাম মুহাম্মদ সা.। তাঁর সিরাত হলো প্রেমের, আত্মত্যাগের, মানবিকতার, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ইবাদতের, নেতৃত্ব, সাহসিকতা ও দূরদর্শিতার শিক্ষা।

রাসুল সা.বলেন, "যে তরুণ আল্লাহর ইবাদতে বড় হয়েছে, কিয়ামতের দিনে সে থাকবে আল্লাহর আরশের ছায়ায়।" (বুখারি ও মুসলিম)

তাহলে কেন এই অনন্ত ফজিলত ছেড়ে ফেলে নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেবে?

তরুণ বন্ধু!

তোমার জীবনের 'গুগল ম্যাপ' ভুল দিক দেখাচ্ছে, কারণ তুমি সেই মূল মানচিত্র ব্যবহার করছ না, যেটি যুগ যুগ ধরে পথ হারানো জাতিগুলোর দিশারি ছিল। সেই মানচিত্র হলো সীরাতুন্নবী সা.। এটি কেবল ইতিহাস নয়, এটি জীবনের দিশা। এটি এক মহাসত্তার গঠনমূলক জীবনবোধ, যা অনুসরণ করলে তুমি হবে সত্যিকার সফল মানুষ।

আসুন, আমরা কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাস্তবের মহাসত্যে ফিরে যাই। রাসুল সা. এর সিরাতকে জীবনের মূলমন্ত্র করি। তারুণ্যকে করি আশীর্বাদ, অভিশাপ নয়। আসুন, বিভ্রান্তির আঁধারে নয়, সিরাতের আলোয় গড়ে তুলি এক নতুন প্রজন্ম, যারা জানবে রাসুল সা.কে, ভালোবাসবে তাঁকে, ও হেঁটে চলবে তাঁর দেখানো আলোকিত পথে।

শিক্ষার্থী, জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া। জিরি, চট্টগ্রাম।

ক্ষমা ও উদারতার অপূর্ব দৃষ্টান্ত

শরিফ আহমাদ

রাসুলুল্লাহ সা. সমগ্র জীবনে ২৭টি যুদ্ধে স্বশরীরে অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে একটি ছিল জাতুর রিকা । এটা বনু মুহারিব গোত্রের বিরুদ্ধে চতুর্থ অথবা ষষ্ঠ হিজরিতে সংঘটিত হয় । এ যুদ্ধে গাওরাস ইবনে হারিস রাসুলুল্লাহ সা.-কে হত্যা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করে। এর বাইরেও মক্কা-মদিনার বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার রাসুল সা.-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা প্রতিবার তাঁকে সুরক্ষা দিয়ে সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেন। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, আর আল্লাহ আপনাকে মানুষদের (ষড়যন্ত্র) থেকে রক্ষা করবেন। (সুরা মায়িদা : ৬৭)
এ যুদ্ধে হত্যাকারীর ষড়যন্ত্র ও রাসুলুল্লাহ সা. এর ক্ষমা করা বিষয়ক হাদিসটি কয়েকটি শিক্ষাসহ উল্লেখ করা হলো;
জাবির ইবনে ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত । তিনি নাজদ এলাকায় রাসুলুল্লাহ সা. এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাসুলুল্লাহ সা. সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলে তিনিও তাঁর সাথে প্রত্যাবর্তন করলেন। পথিমধ্যে কাঁটা গাছ ভরা এক উপত্যকায় মধ্যাহ্নের সময় তাদের ভীষণ গরম অনুভূত হল। রাসুলুল্লাহ সা. এখানেই অবতরণ করলেন। লোকজন সবাই ছায়াবান গাছের খোঁজে কাঁটাবনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। এদিকে রাসুল সা. একটি বাবলা গাছের নিচে অবস্থান করে তরবারিখানা গাছে ঝুলিয়ে দিলেন। জাবির রা. বলেন, সবেমাত্র আমরা নিদ্রা গিয়েছি। এমতাবস্থায় রাসুল সা. আমাদেরকে ডাকতে আরম্ভ করলেন। আমরা সকলেই তার কাছে উপস্থিত হলাম। তখন তার কাছে এক বেদুইন বসা ছিল। রাসুল সা. বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমতাবস্থায় সে আমার তরবারিখানা হস্তগত করে কোষমুক্ত অবস্থায় তা আমার উপর উঁচু করে ধরলে আমি জাগ্রত হই। তখন সে আমাকে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? আমি বললাম, আল্লাহ! দেখ না, এই তো সে বসা আছে। (এ জঘন্যতম অপরাধের পরও) রাসুল সা. তাকে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদান করেননি।
অপর এক সনদে জাবির রা. থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, যাতুর রিকার যুদ্ধে আমরা রাসুলুল্লাহ সা. এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াবান বৃক্ষের কাছে গিয়ে পৌঁছলে রাসুলুল্লাহ সা. এর আরামের জন্য আমরা তা ছেড়ে দিলাম। এমন সময় এক মুশরিক ব্যক্তি এসে গাছের সাথে ঝোলানো রাসুলুল্লাহ সা. এর তরবারিখানা হাতে নিয়ে তা তাঁর উপর উঁচিয়ে ধরে বলল, তুমি আমাকে ভয় পাও কি? তিনি বললেন না। এরপর সে বলল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? তিনি বললেন, আল্লাহ। এরপর নবি কারিম সা. এর সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলেন । এরপর নামাজ আরম্ভ হলে তিনি মুসলমানদের একটি দলকে নিয়ে দু'রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারা এখান থেকে হটে গেলে অপর দলটি নিয়ে তিনি আরও দুরাকাত নামাজ আদায় করলেন। এভাবে রাসুলুল্লাহ সা.- এর হলো চার রাকাত এবং সাহাবীদের হল দু'রাকাত নামাজ। (বুখারি, হাদিস:৩৮৩১) এই হাদিস থেকে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শিক্ষাও উপদেশ পাওয়া যায় ।

এক. আল্লাহর উপর ভরসা রাখা:
জীবনের সবচেয়ে সংকটময় মুহূর্তে রাসুলুল্লাহ সা. একটুও ভীত বা বিভ্রান্ত হননি। তিনি কারও সহায়তা চাননি । কোনো অস্ত্র খোঁজেননি। আততায়ীর হুমকির জবাবে তিনি অবিচল ও নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, আল্লাহ আমাকে বাঁচাবেন। এই ছোট্ট বাক্যে ছিল ঈমান, সাহস ও তাওয়াক্কুলের অপূর্ব সমন্বয়। এটাই প্রমাণ করে, আসল নিরাপত্তা ও রক্ষার মালিক একমাত্র আল্লাহ ।

দুই. ক্ষমা ও উদারতার দৃষ্টান্ত:
রাসুলুল্লাহ সা. ইচ্ছে করলে অপরাধী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারতেন । কিন্তু তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। দুনিয়াতে ক্ষমা এবং উদারতার অপূর্ব নজির স্থাপন করেছেন। বিশ্বকে শিখিয়েছেন ক্ষমাই হলো শক্তির সর্বোচ্চ রূপ, প্রতিশোধ নয় ।

তিন. ইসলাম প্রচারে কৌশল:
মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য উদারতা ও ক্ষমাশীলতা একটি শক্তিশালী উপায়। রাসুলুল্লাহ সা. এর ক্ষমার ঘোষণা শুনে লোকটা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এতে আবারও স্পষ্ট হয় ইসলাম তলোয়ারের জোরে বা বলপ্রয়োগে নয় বরং উদারতার জোরেই সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে গেছে।

চার. যুদ্ধের ময়দানে নামাজের গুরুত্ব:
যুদ্ধের ময়দানে জীবন-মরণ পরিস্থিতিতে রাসুলুল্লাহ সা. ও সাহাবিগণ নামাজ ত্যাগ করেননি। সালাতুল খাউফ পদ্ধতিতে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে নামাজ আদায় করেছেন। এতে প্রতিফলিত হয় নামাজ কোনো অবস্থায়ই মাফ হয় না। তাই সর্বদা সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করাই একজন মুমিনের প্রকৃত পরিচয়।

খতিব ও মাদরাসা শিক্ষক

সিরাতুন্নাবী ﷺ

আফরিন জাহান

রাসুলুল্লাহ সা. সকল মানবকূলের জন্য ন্যায় ও আদর্শের প্রতিক। তিনি এতটাই বিশ্বস্ত ছিলেন যার কারণে তাকে আল-আমিন (বিশ্বাস) এর উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তার চরিত্র এতটাই ভালো ছিলে যে, তা লিখে শেষ করা যাবে না।

২. সিরাত নিয়ে কিছু কথা :

সিরাত হচ্ছে জীবনাদর্শ। রাসুলুল্লাহ এর সিরাত বা জীবনীতে সর্বাধিক যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আল্লাহ আদেশ মেনে চলা এবং তা সকল উম্মাহ এর মাঝে বিলিয়ে দেওয়া। এ ছাড়াও জীবনে অল্পতে তুষ্টি ছিল, প্রিয়নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সিরাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৩. সংক্ষেপে নবির জীবনী:

নবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী লিখলে, কলমের কালি ফুরিয়ে যাবে, শব্দ ফুরিয়ে যাবে কিছু তার আচার-আচরণ এর গুণ শেষ হবে না। তাই সংক্ষেপে তার জীবনী ব্যাখ্যা করা হলো;

জন্ম ও স্থান :

জাহিলিয়া যুগের অন্ধকারময় অবস্থা দূর করে হেদায়েতর আলো নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ৫৭০ খ্রিষ্টপূর্ব মক্কার কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন গোটা মানবজাতির জন্য মহান সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ হতে আশীর্বাদ স্বরূপ।

লালন -পালন ও শৈশব :

জন্মের পূর্বে রাসুলুল্লাহ সা. এর পিতা ইন্তেকাল করেছিলেন। সর্বপ্রথম জননী মা আমেনার দুধ পান করলেও পরে দুধ মাতা হালিমার কাছে লালন পালন হতে থাকে। ৬ বছর বয়সে তার জননী মা আমেনা ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি একেবারে এতিম হয়ে যান। পরে দাদা আবু মুত্তালিব এর স্নেহ বড়ো

হলেও সে সুখ বেশি দিন না যেতেই ৮ বছর বয়সে দাদাও মারা যান। পরে চাচা আবু তালিব এর নেতৃত্ব বড়ো হতে থাকেন। শৈশব থেকেই তিনি মানব জাতির জন্য চিন্তাশীল ছিলেন। শৈশবে তিনি মেষ চড়াতেন।

ব্যাবসায়ীক জীবন :

কুরাইশ বংশের পুরোনো পেশা ছিল ব্যবসা। তার চাচা আবু তালিবও ব্যবসা করতেন এর কারণে তিনিও ছোট থেকে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করেন। পরে সততা, ন্যায়পরায়ণ ও দয়ালুর কারণে কৈশোর বয়সে অনেক খ্যাতি লাভ করেন।

বৈবাহিক জীবন :

ব্যবসার কারণে তিনি সিরিয়া, বাইরান, ইয়ামেন ইত্যাদি জায়গায় অনেকবার সফর করেছিলেন। তার ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু, বিশ্বস্ততা, সচ্চরিত্র ইত্যাদি জন্য অনেক খ্যাতি হলে আরবের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে খাদিজা বিয়ের প্রস্তাব দেন। যখন খাদিজা এবং হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিবাহ সম্পুর্ন হলো তখন রাসুল সা. এর বয়স ছিল ২৫ বছর আর মা খাদিজার ৪০ বছর।

ব্যক্তিগত জীবন:

মহান সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রেরিত নবিও রাসুল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রিয় ও শেষ নবি। তার পর আর কোনে নবি বা রাসুল পৃথিবীতে আসবেন না। রাসুলুল্লাহ ব্যক্তিগত জীবনে এমন ছিল যে, তিনি নিজের জীবনে কোনো কিছু প্রতিফলন না করে উম্মতদের শিক্ষা দিতেন না। আগে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করতেন তারপর সবার মাঝে বিলিয়ে দিতেন। এ ছাড়াও তিনি দয়ালু, নমনীয়, ক্ষমাশীল, সচ্চরিত্রবান ইত্যাদি ছিলেন।

নবুয়ত প্রাপ্তি ও ওহী' লাভ :

হেরা গুহায় ধ্যানরত অবস্থায় হজরত জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নবুয়ত প্রাপ্তি হন। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবুয়ত প্রাপ্তি হন। হজরত জিবরাইল আ. এর মাধ্যমে কুরআনুল কারিমে সুরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত নাজিল হয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওপর।

মক্কা ত্যাগ ও মদিনায় হিজরত:

নবুয়ত প্রাপ্তি পর রাসুলুল্লাহ মক্কার কিছু ইসলাম বিরোধীদের প্রকাশিত দাওয়াত দিলে বিরোধীরা অস্বীকার করে। মক্কার কুরাইশ নেতারা ইসলামের বিরোধিতা করলে, নানা সরযন্ত্র করলে এবং তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিলে মহান সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নির্দেশে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি তার অনুসারী মুসলমানদের নিয়ে হিজরত করেন। সেখানে তিনি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেন।

বিদায় হজ এবং রাসুলুল্লাহ সা. মৃত্যুবরণ :

দশম হিজরি ৯, ১০ জিলহজ মাসে আরাফার ময়দানে তিনি বিদায় হজের ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, হয়তো আপনাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না। এরপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৮৩ দিন বেঁচে ছিলেন। পরে সফর মাসের মধ্যভাগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। সফর মাসের শেষ বুধবার তিনি কিছুটা সুস্থ হলেও ১২ রবিউল আউয়াল তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের প্রতিটা অংশ ছিল একেকটি সিরাত। আমাদের জন্য একেকটি শিক্ষা। তিনি এমন এক মহামানব শুধু ইসলাম নয়, সকল ধর্মের জন্য তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক। তিনি এমন এক মহামানব তিনি ইহকাল ত্যাগ করে গেছেন কিন্তু তার রেখে যাওয়া ইসলাম তার সকল উম্মাহ এখন পালন করছে। রাসুলুল্লাহ এমন এক ব্যক্তি যাকে অনেকে চোখে দেখেনি তবু তার অনুসারী অভাব নাই ।

" হে প্রিয়নবি,
যখন পৃথিবী জুরে ছিল বর্বরতার আধার,
তুমি জন্ম নিয়ে এলে এক আলোর মশাল।
তোমার প্রেমে মেতে ছিল মরু সাহারা
মেতে ছিল আকাশ- বাতাস, মেতে ছিল ধরা।"

ছাত্রী

নবিজির শৈশব, কৈশোর ও যৌবনকাল

খাদিজাতুত তাহিরা

এক মহান চরিত্রের নির্মাণযাত্রা:

সুদূর মরুর বুকে শান্ত এক রাতের সুবেহ সাদিকে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, মক্কার নগরীর কুরাইশ বংশে এক ফুটফুটে শিশুর জন্ম নিলেন। যিনি বদলে দিলেন গোটা মানবতার ইতিহাস। তাঁর নাম রাখা হলো মোহাম্মদ, যার অর্থ "প্রশংসিত"। জন্মের আগেই পিতৃহীন এই শিশুটি ছিলেন মহান আল্লাহর তরফ থেকে বিশ্বের মানবতার জন্য অমূল্য উপহার। যাঁর জীবন হলো গোটা মানব জাতির জন্য রহমত স্বরুপ।

শৈশব: এতিম শিশু, অথচ পূর্ণ আলোয় ভরা

মোহাম্মদ সা. জন্মের আগেই তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন সিরিয়া সফর থেকে আসার পথে। জন্মের পরেই মা আমিনার কোলে কিছুদিন কাটে ভালোবাসার মাঝে। মাত্র ছয় বছর বয়সে মায়ের মৃত্যুতে তিনি প্রকৃত অর্থে এতিম হয়ে যান।

এই শিশুটিকে প্রথম আশ্রয় দেন দাদা আব্দুল মোত্তালিব। আব্দুল মোত্তালিব ছিলেন প্রধান কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্মানিত ব্যক্তি। মোহাম্মদ সা. এর প্রতি ছিল তাঁর গভীর ভালোবাসা। দাদার মৃত্যুর পরে তাঁকে আশ্রয় দেন, চাচা আবু তালিব। তিনি নিজের সন্তান থেকেও হজরত মোহাম্মদ সা. কে বেশি ভালোবাসতেন।

তাঁর শৈশব কেটেছে নিঃশব্দে, কিন্তু শিক্ষামূলক পরিবেশে। তিনি খেলাধুলায় অংশ নিতেন, কিন্তু কোনদিন কারোর কোন ক্ষতি করেননি। যখন আশেপাশের বাচ্চারা ঝগরা লাগত তখন তিনি তা থামাতেন। ছোট কাল থেকেই হজরত মোহাম্মদ সা. ছিলেন নম্র স্বভাবের ও দৃঢ়তা প্রকৃতির।

আরবের রীতি অনুযায়ী শিশুকে বিশুদ্ধ বাতাস ও নিস্বর্গের মাঝে বড় হওয়ার জন্য পাঠানো হতো দুধ মাতার কাছে।

হজরত মোহাম্মদ সা. কে দেওয়া হয়েছিল হালিমা সাদিয়া রা. এর কোলে। হালিমার দরিদ্র পরিবারে মোহাম্মদ সা. এর আগমনের পরেই রহমতের বৃষ্টি নামে। শুকিয়ে যাওয়া জমি, উর্বর হয়, পশুদের দুধ বেড়ে যায়। তখন সবাই বুঝতে পারে এই শিশু, কোন সাধারণ শিশু নন।

কৈশোর: সততা ও দায়িত্বশীলতার নমুনা

কৈশোরে পা রাখার পর হজরত মোহাম্মদ সা. বাস্তবতা শিখতে থাকেন। তখন তিনি ছাগলের মেষ চড়াতেন। এতে করে তিনি একদিকে অর্থ উপার্জন করতেন, অন্যদিকে ধৈর্য ও দায়িত্বশীলতাও অর্জন করতেন। নবি হওয়ার পর এসব কথা বলেন।

এই সময় থেকেই তাঁর সততার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। আরবের লোকেরা তাঁকে ডাকত,"আল-আমিন"(বিশ্বস্ত) ও "আস-সাদিক"(সত্যবাদী)। কেউ তাঁর কাছ থেকে মিথ্যা শোনেনি, কাউকে তিনি ঠকাননি।

তাঁর আশেপাশের কিশোররা যখন মূর্তিপূজা, মদ্যপান, আজেবাজে কাজে মত্ত থাকত, তখন তিনি এসব থেকে দূরে সরে থাকতেন। তিনি সব সময় নিজেকে পবিত্র ও সৎ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।

একবার তাঁর বন্ধুদের সাথে বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবেন এমন পরিকল্পনা হয়। কিন্তু তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় সেই অনুষ্ঠানে পৌঁছাতে পারেনি-তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। আল্লাহ তাঁকে নিজ কুদরতের মহিমা ধারা এসব কাজ থেকে বিরত রাখেন।

যৌবন: সততা, প্রেম ও ভাবনার প্রজ্ঞা

২৫ বছর বয়সে হজরত মোহাম্মদ সা. যুবক হিসেবে পরিপক্বতা লাভ করেন। তখন তিনি তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যে অংশ নেন ও ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া সফরে যান। তাঁর ব্যবসায়িক সততা, হিসাব-নিকাশের স্বচ্ছতা দেখে ও দয়ালু আচরণ দেখে মক্কার এক ধনী ও সম্মানিত নারী খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা. তাঁকে বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দেন।

হজরত মোহাম্মদ সা. ব্যবসা করেন অত্যন্ত সফলভাবে, এবং তাঁর কর্মপদ্ধতিতে খাদিজা রা. এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি নিজেই বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। সেই সময় হজরত মোহাম্মদ সা. এর বয়স ছিল ২৫ বছর, আর অপরদিকে খাদিজা রা. এর বয়স ছিল ৪০ বছর।

এ ছিল এক আদর্শ দাম্পত্যজীবন, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও আস্থা দিয়ে গড়া। খাদিজা রা. তাঁর জীবনের প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সঙ্গী ছিল। হজরত মোহাম্মদ সা. তাঁর জীবিত অবস্থায় আর বিবাহ করেননি।

এই সময় থেকেই হজরত মোহাম্মদ সা. ধীরে ধীরে ভাবনামগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি সমাজের অন্যায়, দারিদ্র্য, নারী নির্যাতন, মূর্তিপূজা এসব দেখে তিনি গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। তিনি রাতের পর রাতে হেরা গুহায় কাটাতেন। নির্জনে আল্লাহর সৃষ্টি ও সমাজের অবস্থা নিয়ে চিন্তার ভাবনায় ডুবে থাকতেন।

শেষ কথা

হজরত মোহাম্মদ সা. এর শৈশব ছিল কঠিন, কিন্তু বরকতময়; কৈশোর ছিল চরিত্র গঠনের সময় আর যৌবন ছিল আদর্শ নেতৃত্বেও প্রস্তুতির সময় কাল।

তাঁর জীবনের প্রতিটি স্তর ছিল শিক্ষা;
শৈশব শেখায় কষ্টের মাঝে ধৈর্য।
কৈশোর শেখায় সততা ও আত্মসংযম।
যৌবন শেখায়, দায়িত্ব, প্রেম ও আদর্শ পথচলা।

তিনি এতিম শিশু থেকে হয়ে ওঠেন মানব জাতির জন্য সবচেয়ে বড় রহমত। হজরত মোহাম্মদ সা. এর জীবনী হলো সকল মানব জাতির জন্য আদর্শ।

ঘিওর ,মানিকগঞ্জ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনদর্শন:

মানবতার চিরন্তন পথপ্রদর্শক

হজরত মোহাম্মদ সা.-একটি নাম, যা কোটি কোটি মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে রয়েছে, মোহাব্বাতের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। আমরা সিরাতের পাতায় ডুবে যাই, কিন্তু সেই মহামানব, যিনি তিমির আঁধারে এসেছিলেন সত্যের মশাল হয়ে। তার জীবনী পড়েও আমরা কেন নিজেদের সংশোধন করতে পারি না? কেন হয় না সমাজসংস্কার? তবে কি আমরা শুধু পড়েই যাই, নাকি হৃদয় দিয়েও উপলব্ধি করি? শিক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করি?

শৈশব ও নবুয়ত পূর্বজীবন:

তিনি ছিলেন সেই ফুটন্ত ফুল গাছ, যাকে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল চারদিকে কাঁটা বিছিয়ে। জন্মের আগেই পিতাকে হারিয়েছিলেন তিনি। শৈশব না পেরুতেই মাতাকে হারিয়েছেন। দাদার আশ্রয়ে কয়েক বছর যেতে না যেতেই তিনিও চলে যান কালের স্রোতে। ভেড়া-বকরী চড়ানোর মাধ্যমেই বিশ্ব নেতৃত্বের শিক্ষা পেয়েছিলেন।

নারী ও মদের দিকে কখনো ফিরেও তাকাননি, নিজের দৃষ্টিকে এক মুহূর্তের জন্য ময়লা হতে দেননি। যে বয়সে যুবকরা সাধারণত বিপথগামী হয়, ঠিক সেই বয়সেই তিনি "হিলফুল ফুযুল" নামক এক শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

নবুয়তের সূচনা এবং প্রথম ইসলাম কবুল কারীগণ

শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন কওমের চোখের মণি। সকলেই তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত। তার উপাধি ছিল আল-আমিন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর কুরআন নাজিল করলেন, নাজিল করলেন সুরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত, "পড়ো তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়ো, তোমার প্রভু সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা সে জানত না।"
(সুরা আল-আলাক: ১৫)

তিনি গৃহে ফিরে আসলেন, খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে শঙ্কার কথা জানালেন। তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং ইসলাম কবুল করলেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলেন।

আচ্ছা, আমরা কি ভেবে দেখেছি-যখন মানুষ এক আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল, যখন পাপে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল এই ধরিত্রী, সবাই দেব-দেবীর পূজায় লিপ্ত ছিল, ঠিক তখনই কতটা বিশ্বাস নিয়ে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তার সাথিরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন! স্বীকার করে নিয়েছিলেন সেই মহান ঘোষণা- "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।"
আমরা কি অনুভব করি, তখনকার পরিস্থিতিটা কেমন ছিল?

প্রকাশ্য দাওয়াত ও বিরোধিতা

অতঃপর যখন সুরা মুদ্দাসসির-এর আয়াত নাজিল হলো: "হে বস্ত্রাবৃত! উঠে দাঁড়াও এবং সতর্ক করো।" (সুরা আল-মুদ্দাসসির: ১২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্য দাওয়াতের আদেশ করা হলো। তখন চারদিক থেকে বাধা আসতে লাগল। কুরাইশরা তাকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগল।

আচ্ছা, তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে-কওমের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তিটিকে এভাবে অপমান করার কোনও যৌক্তিক কারণ ছিল, যেভাবে তারা তাকে পাগল বলতো এবং শিশুদেরও তার পেছনে লাগিয়ে দিত? শুধু ইসলামকে রুখে দেওয়ার জন্যই তারা সেই সম্মানিত ব্যক্তিটির প্রতি একের পর এক অপবাদ আরোপ করত। আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা আপনাকে বলে, আপনার উপর নাকি কুরআন নাজিল হয়েছে! আপনি তো একটা পাগল!" (সুরা হিজর, আয়াত: ৬)

জাহেলিয়াতের প্রতিরোধ

তাদের বিরোধিতার কারণ কী ছিল? হ্যাঁ, এটাই ছিল সেই বিপ্লবাত্মক কালেমার ঘোষণা-যার অর্থ: "তিনি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।"

এই ঘোষণা মানে ছিল-প্রতিমা পূজা বন্ধ, জাহেলি আনন্দ-ফুর্তির ইতি, অন্যায়ের অবসান। তারা ভয় পেয়েছিল, তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি হারিয়ে যাবে। তাই তারা কুরআনকে যাদু বলতে লাগল। তারা বলেছিল: "তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং তিলাওয়াতকালে হট্টগোল সৃষ্টি করো, যাতে তোমরা বিজয়ী হও।" - (সুরা ফুসসিলাত: ২৬)

সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও ত্যাগ

আমরা কি চিন্তা করি? কী ছিল সেই শক্তি! কতটা সুদৃঢ় ছিল তাদের ঈমান-যার কারণে তারা জীবন ত্যাগ করেছেন, কিন্তু ঈমান ত্যাগ করেননি। সুমাইয়া রা. যিনি ইসলামের জন্য প্রথম শাহাদাতবরণ কারী নারী। যিনি জীবন দিয়েছেন তবু ঈমান ত্যাগ করেননি। খাব্বাব রা. যাকে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তবুও তিনি ঈমান ত্যাগ করেননি। বিলাল রা. যিনি "আহাদ, আহাদ" বলতে বলতে নির্যাতন সহ্য করেছেন। মুসআব রা. যাকে ইসলাম গ্রহণের পর শৌখিনতা ছেড়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে হয়েছে। এমনকি একসময় তার দেহের চামড়া সাপের মত খসখসে হয়ে গেছে।

যারা আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা দিত, মুশরিকরা তাদের উপর চালাত সীমাহীন নির্যাতন। কিন্তু তারপরও তারা কেউই ঈমান ছাড়েননি।

রাসুলুল্লাহ সা. এর ধৈর্য ও ক্ষমা

তিনি কতটা ধৈর্যবান ছিলেন! তায়েফে পাথর ছুড়ে রক্তাক্ত করার পরও তিনি দোয়া করেছিলেন। তায়েফবাসীদের থেকে হেদায়েতের আশা করেছিলেন। উহুদের যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি শহিদ হন। তাঁর প্রিয় চাচা হামজা রা. শহিদ হন, মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর পবিত্র দন্ত মুবারক শহিদ হয়। তবুও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। হুনায়ুনে নিজে সেনাপতির দায়িত্বপালন করেছেন। অসাধারণ রণ কৌশল সৈন্যদের সংঘবদ্ধ করেছেন। মক্কা বিজয়ের দিনে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন যাঁরা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। যারা প্রায় বিশ বছর ইসলামের নাম নিশানা মুছে দেওয়ার জন্য তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। রাসূল বলেন, "আজ তোমাদের প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই" " যাও, তোমরা সবাই মুক্ত।" (বাইহাকি: ১৮২৭৫)

সাধারণ জীবনযাপন

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি দশ বছর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত করেছি। তিনি কখনো 'উফ্' পর্যন্ত বলেননি।" (সহিহ বুখারি)

তিনি নিজের কাপড় নিজে সেলাই করতেন, ঘর ঝাড়ু দিতেন এবং উম্মুল মুমিনিনদের কাজেও সাহায্য করতেন।

আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (সা.) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনো পাতলা রুটি অথবা ভুনা গোশত দেখেছেন কিনা, আমি জানি না।"

- (সহিহ বুখারি ৫৪২১, ৬৪৫৭)

তিনি দোজাহানের সম্রাট। তিনি চাইলে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতেন, কিন্তু তা করেননি। তিনি ছিলেন "رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ"-সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত।

আমাদের উচিত তাঁর সিরাত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। সত্য, ধৈর্য, দয়া, ন্যায় ইত্যাদি গুণাবলি অর্জন করা। তিনি যেভাবে সত্য প্রচার করে মানুষকে জয় করেছেন, আমরাও যদি সেই পথ অনুসরণ করি, তবে আল্লাহ আমাদের সফলতা দান করবেন এবং খেলাফতের সোনালি যুগ ফিরিয়ে দেবেন, ইনশাআল্লাহ।

উম্মুল বারাকাহ

কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম।

নবিপ্রেমের দুই উজ্জ্বল তারা

আনিসুর রহমান হাসান

আরবের মরুশহর। মক্কা কিংবা ইয়াসরিব-যা পরে রূপান্তরিত হয় মদিনাতুর রাসুল নামে। এ মরুশহরগুলোতে নবি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্য দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে আগমন করলেন। নবিজির দাওয়াত শুনে কতিপয় তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। পূর্বপুরুষের ধর্মকে মুহাম্মদ ছেড়ে দিতে বলছে! না এটা মেনে নেওয়া যায় না। এই মেনে না নেওয়া থেকে শুরু হয় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অকথ্য নির্যাতন। সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার। যারা নবিজিকে কষ্ট দিচ্ছিল, তারা আর কেউ নয়, সগোত্রীয় কিছু মানুষ। সম্পর্কে যারা ভাই, চাচা ও দাদা।

আরবের একাংশ যখন নবিজিকে কষ্ট দিতে ব্যস্ত, তখন অন্য অংশে ছিল ভিন্ন চিত্র। যদিও সে অংশে লোকসংখ্যা কম; তবে তাদের মাঝে ছিল ভরপুর প্রেম। যারা নবিজিকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালোবেসে ছিল। নতশিরে মেনে নিয়েছিল সত্যের ডাক। কাফির-মুশরিকরা যখন নবিজিকে কষ্ট দিত; তখন তারা কুঁকড়ে কাঁদতেন। বুকে প্রেম নিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেতেন। নবিজির ওপর আসা সমস্ত আঘাত ঢালস্বরূপ প্রতিহত করতেন। তারা নবিজিকে বন্ধু, অভিভাবক, প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। সারাক্ষণ নবিজির পাশে ঘুরঘুর করতেন, তার সঙ্গ পেলেই যেন মনে প্রশান্তি, দেহে স্বস্তি। সবসময় সঙ্গদানের কারণে তাদের নাম হয়ে যায় 'সাহাবী' (রাসুলের সঙ্গী)।

রাসুলের দুজন সাহাবি, একজনের নাম 'মুসআব ইবনে উমাইর' অন্যজন 'জুলাইবিব'। দুজন যেন দুই মেরুর মানুষ। মুসআব মক্কার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। গায়ের রং চমৎকার, পোশাক-আশাকে বাদশাহি ছাপ। এ সুদর্শন পুরুষের প্রেমে পাগল মক্কার সমস্ত যুবতী। তাদের কামনা-কল্পনায় সদা মুসআব বিরাজমান। কিন্তু মুসআব দুনিয়াবি প্রেমকে তোয়াক্কা করলেন না, তিনি অপার্থিব প্রেমে মজলেন। তাইতো শানশওকত, শাহী বালাখানা ছেড়ে-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর কালিমা পড়ে বেছে নিলেন বিসর্জনের জীবন। ভালোবেসে ফেললেন সেই মানুষটিকে যিনি বলেছিলেন, এই দুনিয়া কেবল ধোঁকা, আমার উম্মতদের জন্য জান্নাত অপেক্ষমাণ।

অন্যদিকে জুলাইবিব ছিল সমাজের অচেনা, নিচু বংশের মানুষ। ছিল না গৌরব, শৌর্যবীর্য; গায়ের রংটাও ছিল কুৎসিত। দেহ ছিল খর্বাকৃতির। সকলের চোখে উপহাস্য। কেউ তাকে প্রেম দেবে তো দূরের কথা, সহানুভূতিও দেখায় না। তবে এ অবাঞ্ছিত মানুষের মনেও প্রেম জেগেছিল-নবীপ্রেম। মজলিসের এক কোনায় বসে অপলক চেয়ে থাকে নবিজির চেহারা মুবারকের দিকে। নবিজিও এ নিঃস্বার্থ প্রেমিককে কাছে টেনে নিলেন। বিয়ে করালেন মদিনার সবচেয়ে সুন্দরীকে। জুলাইবিবও খুঁজতে থাকেন প্রেমের প্রতিদান দেওয়ার সুযোগ।

নবিজির দুই তারা, ব্যতিক্রম দুজন মানুষ। তবে দুজনে এক মোহনায় এসে মিশে একাকার হয়ে গেছে। সে মোহনার নাম-নবীপ্রেম। এ সম্মিলনে গাত্রবর্ণ, বংশ, গৌরবের কোনো মূল্য নেই; এখানে প্রেমই অস্তিত্ব থেকে চূড়ান্ত ফলাফলের মাপকাঠি। যে যত ভালোবাসতে পেরেছে, সে ততই উজ্জ্বল হয়েছে। তাইতো তারা প্রেমের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন নির্দ্বিধায়।

উহুদের রণক্ষেত্র। মুসলমানরা শুরুতে আধিপত্য বিস্তার করলেও কিছু ভুল করে বসেন। আর তার সুযোগ নেয় মক্কার কাফেররা। পালটা আক্রমণে তছনছ করে দেয় মুসলিম শিবির। মুসলমানরা ছুটতে থাকে এদিক-সেদিক। কিন্তু কিছু সাহবী সজাগ। জীবন বাজি রেখেছেন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেফাজত ও নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। কেউ কেউ ভাঙা তরবারি আর ক্লান্ত দেহ নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। মুসআব ইবনে উমাইর তাদের মাঝে একজন। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে শহিদ হয়ে যান।

জুলাইবিব সদস্য বিয়ে করেছেন। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের দামামা বাজায় তিনিও যুদ্ধে শরিক হন। দেহটা ছোট ছিল, কিন্তু প্রেমে কমতি ছিল না। উহুদের কঠিন সময়টাতে ছোট দেহ নিয়ে লড়াই চালিয়ে একসময় তিনিও শহিদ হয়ে যান। যুদ্ধ শেষে সবাই শহিদদের লাশ খুঁজে আনেন। নবিজি খোঁজেন জুলাইবিব কোথায়? পথে জুলাইবিবের লাশ পাওয়া যায়। নবিজি তার নিথর দেহটা কবরে রেখে বলেন, সে আমি আর আমি তার।

ওদিকে শহিদ মুসআবকে কাফন দেওয়ার জন্য কাপড় সংকট। মাথা ঢাকলে পা খুলে যায়, পা ঢাকলে মাথা। নবিজি নির্দেশ দিলেন, কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে-ঘাস দিয়ে পা ঢেকে নিতে। তারপর বললেন, 'মুসআব, তুমি ছিলে মক্কার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা-পাওয়া ছেলে। আজ তুমি চিরপ্রেমের শহিদ!'
মুসআব রা. ও জুলাইবিব রা. ছিলেন ভিন্ন দুরকমের মানুষ। কিন্তু নবিজির প্রেমে তারা যেন এক আলোকবর্তিকা। তারা প্রমাণ দিয়ে গেলেন, নবির প্রেম কোনো সামাজিক মানদণ্ডে মাপা যায় না। তা চেহারায় না, বংশে না, ধনে না-তা মাপতে হয় হৃদয়, আত্মত্যাগ এবং প্রিয় নবির পথে নিঃস্ব স্বর্পণে। নবিজির এ দুই তারকা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য ভালোবাসার নাজরানা হিসেবে থেকে যাবে। যদি কেউ মুসআব কিংবা জুলাইবিবের মতো একফোঁটা ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে, তবে সেই হবে তাদের উত্তরসূরি।

দুর্গভেদী ঈমানের জ্যোতি

মুবতাসিম রিয়াজ

সাত আকাশের নিচে, একটি জনপদ-খায়বার। দুর্গনগরীর গায়ে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের কণ্টকময় অধ্যায়। খেজুরবাগিচায় ভরা, পর্বতশ্রেণিতে ঘেরা, প্রাচীরবেষ্টিত এই অঞ্চল ছিল একদা ইসলামের শত্রুদের অন্যতম ঘাঁটি।

৭ম হিজরির সফর মাস-মরুপ্রান্তরের বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল ঈমানের ঘোষণা। যে মাসে এক ধ্বংসপ্রায় জাতি প্রতিরোধ করেছিল বাতিলের দুর্গ, আর ঈমানী তরবারির ঝলকে মুছে দিয়েছিল চক্রান্তের রক্তাক্ত ছায়া।

খায়বার ছিল হিজাজ অঞ্চলের একটি ধনাঢ্য ও সুরক্ষিত নগরী। মদিনা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এ অঞ্চলটি ছিল ইহুদি জনবসতির কেন্দ্রস্থল। ৭টি দুর্গ বা কেল্লায় বিভক্ত-প্রতিটি দুর্গ ছিল বেষ্টনী, পরিখা ও অস্ত্রাগারে সুসজ্জিত। এখানকার অধিবাসীরা কৃষি, বাণিজ্য ও অস্ত্র তৈরিতে পারদর্শী ছিল। আর সবচেয়ে বড় বিষয়-তারা ছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরতিহীন ষড়যন্ত্রের স্থায়ী কারখানা। বনু নাযীর ও বনু কুরাইযা গোত্রের বহু সদস্য-যারা মদিনায় বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছিল-তারা খায়বারে আশ্রয় নিয়ে ইসলামি রাষ্ট্রবিরোধী চক্রান্তে জড়িত হয়ে পড়ে। তাদের এই বিদ্বেষ শুধু মৌখিক নয়; তারা মক্কার কুরাইশ, গাতফান, ও অন্যান্য গোত্রের সঙ্গে মিলে আহযাব যুদ্ধ (খন্দকের যুদ্ধ) এর নেপথ্য চক্রান্তে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিল।

খায়বার ছিল চক্রান্তকারীদের দুর্গ, ইসলামবিরোধী অর্থ ও অস্ত্রের উৎস।
হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে মুসলমানদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য রাসুল ﷺ সিদ্ধান্ত নেন যে, এই ষড়যন্ত্রের ঘাঁটি ভেঙে দেওয়ার সময় এসেছে। হিজরি সপ্তম বর্ষ। মদিনা তখন ধূলিমলিন বিকেলে ঢাকা। মুহাররম মাসের গোধূলি লগ্নে ১৪০০ সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে মহানবি ﷺ যাত্রা করলেন খায়বারের দিকে। উদ্দেশ্য একটিই-চক্রান্ত ও অন্যায়ের কেন্দ্রবিন্দুকে নিষ্ক্রিয় করা, এবং সত্যের পতাকা উড্ডীন রাখা। সেনাবাহিনীর প্রধানদের মধ্যে ছিলেন- আবু বকর রা., উমর রা., আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রা., এবং সর্বোপরি, যুদ্ধের এক প্রবাদপুরুষ-হজরত

আলি রা.। খায়বারে পৌঁছে একের পর এক দুর্গ ঘিরে ফেলেন মুসলিম বাহিনী। প্রথমে আক্রমণ করা হয় নাঈম, সাবি', এবং কাতিবা নামক দুর্গসমূহে। ইহুদিরা অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, কিন্তু মুসলমানদের ঈমানী জোয়ার ও কৌশলী পরিকল্পনার সামনে ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। নবী ﷺ প্রতিদিন নতুন কমান্ডার নিযুক্ত করতেন, যাতে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহস ও নতুন কৌশল নিয়ে আক্রমণ চালানো যায়। একপর্যায়ে তিনি ঘোষণা করেন: "আগামীকাল আমি পতাকা তুলে দেবো সেই ব্যক্তির হাতে, যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসেন, আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তাঁকে ভালোবাসেন।" - (সহিহ বুখারি, হাদিস: ৩৭০১)

পরদিন ভোরে রায়াত তুলে দেওয়া হয় হজরত আলি রা.-এর হাতে। তাঁর চোখ ছিল ব্যথায় জর্জর, রাসুল ﷺ তাঁর চোখে নিজের লালা মাখিয়ে দেন। মুহূর্তেই আরোগ্য আসে-চোখে যেমন দৃষ্টি, হৃদয়ে তেমনি দীপ্তি। এরপর আলি রা. হাতে তুলে নিলেন জুলফিকার, রাসুল ﷺ-এর উপহার দেওয়া কিংবদন্তি তরবারি। জিহাদের পতাকা নিয়ে এগিয়ে যান খায়বারের সবচেয়ে মজবুত ও কুখ্যাত দুর্গ "কামুস"-এর দিকে। সেখানে তাঁকে মোকাবিলা করতে হয় খায়বারের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যোদ্ধা মারহাবকে। যুদ্ধক্ষেত্রে মারহাব দম্ভে গর্জে ওঠে, "খায়বার জানে যে, আমি মারহাব, যুদ্ধের অস্ত্রে সজ্জিত এক অভিজ্ঞতাপূর্ণ বীর বাহাদুর ব্যক্তি। যুদ্ধের ময়দানে কেউ নেই আমার সমান।"

তখন আলি রা. তাঁর ঈমানি কণ্ঠে উত্তর দেন- "আমি সেই ব্যক্তি, যার মা রেখেছে নাম হায়দার! যার দর্শন বন্য সিংহের মত ভয়ংকর। আমি দুশমনদের অবলীলায় হত্যা করি!"

দুটি তরবারি ক্রোধে ছুটে এলো একে অপরের দিকে। ইতিহাস থমকে গেল কিছু মুহূর্তের জন্য। হজরত আলি রা. এর যুলফিকারের আঘাতে মারহাব দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এটি ছিল এমন এক আঘাত যা বাতিলের গর্ব চূর্ণ করে দেয়। যুদ্ধে একপর্যায়ে কামুস দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ হয়ে গেলে, মুসলিম বাহিনীর অগ্রগতি ব্যাহত হয়। তখন হজরত আলি রা. একা হাতে সেই বিশাল লোহার ফটকটি উপড়ে ফেলেন এবং আক্ষরিক অর্থেই তুলে ছুড়ে ফেলেন শত্রুর দিকে, যার ওজন এতটাই বেশি ছিল যে সাত সাহাবি মিলে পরে সেটিকে সরাতে পারেননি।

কামুস দুর্গ তখন মুসলমানদের দখলে চলে এলো। সাহাবিদের তাকবিরে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠল- "আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার!"

খায়বারের একে একে সমস্ত দুর্গ মুসলমানদের অধীনে আসে। যুদ্ধ শেষে মুসলিম বাহিনী লাভ করে: বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও রসদ, খেজুরবাগান ও জমির মালিকানা (যার একটি অংশ 'মুসালিমা' হিসাবে রেখে দেওয়া হয়), মুক্তি পায় বহু ক্রীতদাস ও নির্যাতিতজন। খায়বার বিজয় ইতিহাসের একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়, যেখানে ঈমানী তলোয়ার বাতিলের দুর্গ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। খায়বার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-বাতিল যতই সুদৃঢ় হোক, ঈমানের তরবারি যদি শুদ্ধ হয়, তবে বিজয় নির্ধারিত।

হে ইতিহাস! তুমি সাক্ষী থেকো-

একদা মরুর বুকে ঈমানের অগ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল, যা ভেঙে দিয়েছিল বাতিলের দুর্গ, আর মানবতার আকাশে লিখে দিয়েছিল, "বলুন: সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলীন হয়েছে; নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলীন হওয়ারই কথা।" (সুরা বনী ইসরাঈল: ৮১)

শিক্ষার্থী, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

মানবতার রাষ্ট্র: রাসুলের শাসনচিত্র

মুহাম্মদ মুহিব্বুল্লাহ

তাওহীদের পবিত্র আলো যখন নিভুনিভু, তখনই পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল শিরকের ঘোর অন্ধকার। রুবুবিয়্যাতের অর্থাৎ আল্লাহর একক পালনকর্তৃত্বের মহান ধারণা পতিত হয়েছিল মানুষের হাতে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তির পদতলে। মানবসমাজ হারিয়ে গিয়েছিল জাহেলিয়াতের ঘন ঘোর অন্ধকারে। যেখানে নারীর ছিল না কোনো অধিকার, জীবন্ত কন্যাশিশুকে কবর দেওয়া হতো, গোত্রের অহংকারে রক্ত ঝরানো হতো অহর্নিশ, আর অবিচার, জুলুম ও দম্ভ ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। এমন একসময়ে পৃথিবী হয়ে উঠেছিল অশান্তি ও অনৈতিকতার অন্ধকূপ।

ঠিক তখনই, অন্ধকারে ডুবে থাকা মানবজাতির দিগন্তে উদিত হলেন মহানবি হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি এলেন না কোনো দুনিয়াবি শক্তির দম্ভ নিয়ে, বরং এলেন এক অনন্ত আধ্যাত্মিক আলোর বার্তা নিয়ে। তাঁর নেতৃত্বে মক্কার বুকে উদিত হল ইসলামের আলো, আর মদিনায় প্রতিষ্ঠিত হল ইতিহাসের এক মহত্তম রাষ্ট্র, যেখানে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ছিল শাসনের মেরুদণ্ড, এবং কুরআন ছিল রাষ্ট্রপতি ও প্রজার জীবনচর্চার একমাত্র দিকনির্দেশনা।

এই নববি রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল চারটি:

প্রথমত, ন্যায়বিচার। তিনি কুরআনের নির্দেশে বলেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে" (সুরা শূরা ১৫)।

সে ইনসাফে কোনো প্রভাবশালী, কোনো আত্মীয়, এমনকি নিজের পরিবারও রেহাই পায়নি। এক সম্ভ্রান্ত নারী চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দৃঢ়ভাবে বলেন, "তোমরা কি আল্লাহর বিধান থেকে বিরত রাখার জন্য সুপারিশ করতে এসেছ?" অতঃপর তিনি মিম্বারে উঠে ঘোষণা করেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এই জন্য যে, তারা সম্ভ্রান্তদের ছেড়ে দিত, আর দুর্বলদের শাস্তি দিত।"

দ্বিতীয়ত, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ। কুরআন নির্দেশ করে, "তোমরা সৎকাজের আদেশ করো এবং অসৎকাজ নিষেধ করো" (সুরা আলে ইমরান ১১০)। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই ছিলেন এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

তৃতীয়ত, মানবাধিকারের সাম্য ও ভেদাভেদহীনতা।
তিনি ঘোষণা করেন, "আরবের উপর অনারবের, গরিবের উপর ধনীর কোনো শ্রেষ্ঠতা নেই। শ্রেষ্ঠ সেই, যে আল্লাহভীরু।" ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই পেয়েছিল সমান মর্যাদা ও অধিকার।

চতুর্থত, আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাসনে কেউ ধনী বা গরিব, দাস বা প্রভু বলে আলাদা ছিল না। ইনসাফ ছিল সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য।

এই চার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রাসুলের রাষ্ট্র শুধু একটি রাজনৈতিক কাঠামো ছিল না, তা ছিল ন্যায়, করুণা, এবং খোদাভীরুতার এক বাস্তব প্রতিচ্ছবি। তাঁর শাসনব্যবস্থা এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছিল, যার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল রোম, পারস্যসহ বহু সাম্রাজ্যের প্রাচীরে। ইসলামের এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা বিশ্ব পেয়েছিল এক নৈতিক বিপ্লবের সাক্ষ্য, যা কেবল ইতিহাসের গর্ব নয়, বরং ভবিষ্যতের পথনির্দেশকও বটে।

আজ, যখন পৃথিবী আবার অশান্তির দাবানলে জ্বলছে, জুলুম ও বৈষম্যে ক্লান্ত মানবতা পথ হারিয়ে ফিরছে আধুনিক জাহেলিয়াতের দিকে, ঠিক তখনই প্রয়োজন সেই আলোকিত পথের দিকে ফিরে দেখা। কারণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাষ্ট্রনীতি কেবল অতীতের গৌরব নয়, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও একমাত্র আশ্রয়। তাঁর দেখানো পথই আমাদের শেখায় যে, সমাজে ইনসাফ, সাম্য ও খোদাভীতি আছে, সে সমাজই পারে সত্যিকার অর্থে শান্তি ফিরিয়ে আনতে।

তাই এই যুগেও আমাদের পরিত্রাণ নিহিত সেই নববি আদর্শে। প্রয়োজন, সেই শিক্ষাকে ধারণ করা, জীবনের প্রতিটি স্তরে তা বাস্তবায়ন করা। তাহলেই ফিরে আসবে শান্তি, ফিরে আসবে হারানো মানবতা। আবার গড়ে উঠবে আলোর এক রাষ্ট্র।

প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক

ফাতহে মুবিন

জাবের আব্দুল্লাহ

১. অষ্টম হিজরি। রমজান মাস। মদিনার অলিগলিতে প্রাণচঞ্চলতা। বাজারগুলো সরগরম হয়ে উঠেছে। সবাই জরুরি কেনাকাটা সারছে। ঘরে ঘরে নতুন বিজয়ের নীরব প্রস্তুতি চলছে। কিছুদিন আগে নবিজির কাছে খবর এসেছে কুরাইশ মিত্র বনু বকর হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বনু খুজা'আর উপর অতর্কিত হামলা করেছে। খবর শুনে নবিজি মক্কাবাসীর বোকামিতে দুঃখিত হলেও প্রতিনিধিদলকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। কদিন হলো আবু সুফিয়ান মদিনায় চুক্তিনামা নবায়ন করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে। তার ব্যর্থতার গল্প শুনে কুরাইশের পিলে চমকে উঠেছে। তারা কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না।
১০ই রমজান। সব রকমের প্রস্তুতি শেষে দশ হাজারের বিশাল বাহিনী নিয়ে নবিজি চললেন মক্কার পথে। প্রাণের শহরে ফাতহে মুবিনের উদ্দেশে।

২. মুসলিম বাহিনী মক্কার অদূরে মাররুয যাহরানে এসে পৌঁছেছে। এশার নামাজ শেষে এখানেই রাতটা কাটানোর ইচ্ছে তাদের। ক্লান্ত-শ্রান্ত সাহাবিরা একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবেন বলে পৃথক পৃথক তাঁবু টানিয়েছেন সবাই। প্রতিটি তাঁবুর সামনে আগুন জ্বালানোর নির্দেশ দিয়েছেন নবিজি। তাই দশ হাজার তাবুর সামনে দশ হাজার অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে পুরো ময়দান। যেন আলোর ফোয়ারা নেমে এসেছে নশ্বর পৃথিবীতে।
আব্বাস রা. নবিজির সাথে যুদ্ধের ময়দানে এই প্রথম। মুসলমান হয়েও মক্কায় বসবাসের সুবাদে মুসলিম বাহিনীর অধীনে এর আগে জিহাদ করার সুযোগ হয়নি তার। মাররুয যাহরান প্রান্তরে আজ মুসলিম বাহিনীর অভূতপূর্ব এই দৃশ্য দেখে তাই তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ মক্কাবাসীর জন্য তার দরাজ দিল ব্যাকুল হয়ে উঠল। যত যাই হোক তারা স্বদেশবাসী। তাদের মাঝে বইছে একই খুনের অটুট ধারা। তিনি নবিজির সাদা খচ্চরে চড়ে বসলেন। আজ নবিজির ক্রোধ থেকে কুরাইশের বাঁচার কোনো পথ আছে কিনা একটু খুঁজে দেখতে চান তিনি।

৩. নবিজির সামনে বুকভরা আতঙ্ক নিয়ে নতমুখে বসে আছে আবু সুফিয়ান। আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাথে করে নিয়ে এসেছেন তাকে। তার চোখেমুখে বিস্ময়। তাদের অজান্তে এত বড় বাহিনী নিয়ে মক্কার দ্বারপ্রান্তে কী করে এসে পৌঁছলেন মুহাম্মাদ! এ স্বপ্ন নয়তো!
উমর রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গমগমে ভরাট কণ্ঠ তার ভুল ভেঙে দিল। তিনি নবিজিকে উদ্দেশ করে বলছেন, হে আল্লাহর রাসুল! অনুমতি দিন, আমি এই কাফেরের মাথা ঘাড় থেকে আলাদা করে ফেলি? পাশ থেকে চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আবদারমাখা ব্যাকুল কণ্ঠ ভেসে এলো, 'আল্লাহর রাসুল! আমি তাকে নিরাপত্তা দিয়ে এনেছি।'
নবিজি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে শান্ত করলেন। এবং উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে আবু সুফিয়ানের ক্ষমাপ্রাপ্তির ঘোষণা দিলেন।
এবার যেন আবু সুফিয়ানের অভিভূত হওয়ার পালা। আনন্দ আর উত্তেজনায় কিছুক্ষণ কিছুই বলতে পারল না সে। নবিজির এমন ব্যবহারে সে যেন নির্বাক মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। অপার্থিব ভালোলাগা আর ভাবাবেগ হঠাৎ তার অন্তরে জ্বলে উঠল ঈমানের নুর। পরম ভালোবাসায় সে উচ্চারণ করল কালিমায়ে শাহাদাত। সাথে সাথে আবু সুফিয়ান হয়ে উঠলেন সাহাবিয়ে রাসুল। উম্মতে মুসলিমার শ্রদ্ধার পাত্র—রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।
অবশেষে সামান্য কিছু সৈন্যের বাধাবিপত্তি পাড়ি দিয়ে মক্কা বিজয় হয়ে গেল। একদিন যারা জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ করে নবি মুহাম্মাদ সা.-কে মাতৃভূমি ত্যাগে বাধ্য করেছিল, নবিজি আজ বিজয়ী বেশে সেসব নিয়ে কিছুই বললেন না। বরং তাদের সামনে পেশ করলেন মহানুভবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বললেন ক্ষমা, প্রীতি এবং সহানুভূতির কথা। এভাবেই পবিত্র নগর শুদ্ধতার পরশ পেয়ে আবার পবিত্রতায় ছেয়ে গেল।

জামি'আতুল আববার রাহমানিয়া মাদরাসা মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

ধূলিরাজির মধ্যে দীপ্ত নক্ষত্র:

সিরাতের বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি

রৌদ্রদগ্ধ মরুপৃষ্ঠের তপ্ত কণিকায়, যেখানে নীরবতা চিৎকার করে ওঠে আর ধুলোকণা ক্রন্দন করে ইতিহাসের দীর্ঘশ্বাসে- সেখানেই শুরু হয় এক অস্তিত্ববাদী বিপ্লবের পঙ্ক্তিমালা। এই বিপ্লব অস্ত্রের নয়, শব্দের নয়, রাজ্যজয়ের নয়; এটি এক আধ্যাত্মিক শুদ্ধি, এক অনন্ত আত্মমুক্তি, যা শুরু হয় এক নিঃস্ব শিশুর নিঃশব্দ কান্না দিয়ে। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ—এক নাম, এক নক্ষত্র, এক মৌন আলোকচ্ছটা, যাঁর জীবনী আজও হৃৎস্পন্দনে ঢেউ তোলে।

সিরাত কোনো ঘটনাপঞ্জি নয়, কোনো জীবনীগ্রন্থের জ্যামিতিক বিন্যাস নয়। এটি এক সত্তাগত উপাখ্যান, যেখানে প্রত্যেকটা ঘটনা একেকটি বিমূর্ত অনুরণন—যা দেহ ছুঁয়ে যায় না, বরং চেতনার গহিনে শিকড় গেড়ে বসে।

মাতৃহীন, পিতৃহীন, দারিদ্র্যের অন্ধকারে জ্বলে ওঠা এক দীপশিখা—এই ছিল তাঁর শুরু। কিন্তু সেই নিঃস্বতা ছিল মহত্ত্বের অনুর্বর ভূমি। তিনি বেড়ে ওঠেন অনন্তের দিকে নিরীক্ষিত হয়ে, জ্যোতির প্রতীক্ষায়। আর সেই প্রতীক্ষা ছিল না কোনো বিষণ্নতার, বরং ছিল এক আধ্যাত্মিক উদ্বেগের- কোথাও যেন কিছু একটি অনুপস্থিত, কোনো চিরন্তন সত্য যেন কণ্ঠনালিতে জমে আছে।

তাঁর শৈশব হিরার গহ্বরে আত্মগহনতার এক অনবদ্য যাত্রা, যেখানে প্রথার কোলাহলকে পেছনে ফেলে তিনি গড়ে তোলেন এক নৈঃশব্দ্যময় আত্মারত্ন।
যখন মানুষ উচ্চারণে হারায়, তখন মহৎ আত্মারা নীরবতায় কথা বলেন। হেরা গুহার নিস্তব্ধতা ছিল না একঘেয়েমি, বরং এক দ্যুতিময় অন্তর্মুখী বিস্ফোরণ। "إقرأ"-এই শব্দটি ছিল এক মহাজাগতিক আহ্বান; যেখানে পাঠের নয়, বরং দর্শনের সূচনা ঘটে। পাঠ্য ছিল না কেবল শব্দের, বরং তা ছিল চেতনা ও অন্তরের নৈতিকতার।
এই শব্দের অভিঘাতে মানবতার সব কাঁটাতার ছিন্ন হয়ে গেল। শুরু হলো ধূলিমলিন বিশ্বকে পরিশুদ্ধ করার এক নিঃশব্দ উত্থান।

তাঁর দাওয়াত ছিল এক ধ্যানমগ্ন নদী, যা ভাষাহীন হৃদয়ের ভাষায় কথা বলে। কোনো তলোয়ার নেই, নেই হুংকার, নেই সমাবেশের ধ্বনি। আছে শুধু চরিত্রের আলোকপ্রভা, আচরণের বুননে বোনা সত্য। তিনি মানুষকে জয় করেন

হৃদয়ের দীপ্তিতে, বাক্যের অনুপমতায় নয়, বরং নীরবতার ব্যঞ্জনায়।

তাঁর দাওয়াত এক রহস্যময় সংলাপ-যেখানে আল্লাহর পথে আহ্বান কোনো বাগ্মিতার স্ফূরণ নয়, বরং প্রেমের আত্মসমর্পণ। এ এক প্রেম, যা মরুভূমির নিঃস্ব বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে; এক দীপ্তি, যা অন্ধকারের অঙ্গে আলো সঞ্চার করে।

তিনি ছিলেন আতিথেয়তার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। না, এটি কেবল খাদ্যসংবর্ধনার বৃত্ত নয়; বরং এক মহাজাগতিক গ্রহণযোগ্যতার রূপ। তাঁর ঘর ছিল মাটির, চাদর ছিল পাথরের মতো রুক্ষ, কিন্তু হৃদয় ছিল বিস্তীর্ণ সমুদ্র-যেখানে শত্রুও নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়।

তিনি দিতেন-নিজেকে, তাঁর প্রশান্তি, তাঁর দৃষ্টি, তাঁর কান্না। কারও অনুযোগ শুনে তিনি হাসতেন, যেন করুণার সব পুষ্প নিজেই বহন করছেন। তাঁর আতিথেয়তা এক আধ্যাত্মিক ভাষা-যার ব্যাকরণ ছিল ক্ষমা, আর ছন্দ ছিল ভালোবাসা।

সিরাতের প্রতিটি পদচিহ্ন যেন একেকটি ভূ-রূপক। পাহাড়-উহুদের নীরবতা, হুনাইনের স্পর্ধা, সাফার দৃঢ়তা-সবই বহন করে প্রতিকূলতা ও আত্মত্যাগের প্রতিমা। আর মরুভূমি? সেটি এক নিঃসঙ্গ হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি-যেখানে দুনিয়ার মোহ শুকিয়ে গিয়ে কেবল থাকে আল্লাহর প্রেমের তৃষ্ণা।

এবং ধূলি-সেই অনন্ত স্মারক, যা পদতলে পড়ে থেকেও নবির স্মৃতি হয়ে উড়ে বেড়ায় কালের গহন পথে। রাসুলের জীবন যেন এই তিনের সমাহার-স্থিরতা, নিঃসঙ্গতা ও স্মরণীয়তায় গঠিত এক বিশুদ্ধ জীবনশিল্প।

তিনি ক্ষমা করেছেন—যেখানে আমরা প্রতিশোধ খুঁজি। তায়েফের রক্তাক্ত অশ্রু, উহুদের ছিন্ন মুখাবয়ব, মক্কার প্রতিহিংসাপরায়ণ শাসকগোষ্ঠী—সবকিছুকে তিনি ভেঙেছেন ভালোবাসার ছোঁয়ায়। এই ক্ষমা কোনো দুর্বলতার ফল নয়, বরং এক আত্মসর্বস্ব মুক্তির অভিজ্ঞান।

তিনি যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু যুদ্ধকে ভালোবাসেননি। তিনি বিজয় পেয়েছেন, কিন্তু অহংকার করেননি। তাঁর জিহাদ ছিল আত্মার বিরুদ্ধে, তাঁর বিজয় ছিল চরিত্রে। তিনি ছিলেন এমন এক প্রেমিক, যিনি মানুষকে সৃষ্টিকর্তার দিকে টেনে নেন—তাদের অন্তরে আলোর স্পর্শ রেখে।

সিরাত হলো এক অস্তিত্ববাদী প্রতিচ্ছবি, যেখানে মানুষ তার ক্ষুদ্রতা ও মহানতাকে একত্রে আবিষ্কার করে। রাসুলের জীবন আমাদের শেখায়—কীভাবে আত্মত্যাগে মহত্ত্ব, নিঃশব্দতায় বিপ্লব এবং প্রেমে ত্যাগ নিহিত।

তিনি ছিলেন এক নৈতিক ধ্রুবতারা, যার আলোয় আমরা দিক খুঁজি। তিনি ছিলেন এক জীবন্ত কুরআন, যার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল ওহির ভাষ্য। তাঁর নিশ্বাসে ছিল আখিরাতের সুবাস এবং তাঁর কান্নায় ছিল দুনিয়ার মায়া ভাঙার মাধুর্য।

আজও এই বিশ্ব নীরব অন্ধকারে হাঁটছে—বিভ্রান্ত, শূন্য, আত্মবিচ্যুত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন যেন সেই আলোকবর্তিকা, যার দীপ্তি কেবল পথ দেখায় না, বরং হৃদয়কে রূপান্তরিত করে।

সিরাত মানে শুধু এক ঐতিহাসিক অধ্যায় নয়, এ এক আত্মসংশোধনের দর্পণ, এক হৃদয়াবেগের সুরলিপি, এক প্রেমের সমর্পণ। সিরাত পাঠ মানে-আত্মার উপর আলোর প্রলেপ দেওয়া, দুনিয়ার শব্দ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর শব্দে প্রবেশ করা।

তিনি চলে গেছেন, কিন্তু রেখে গেছেন এক চিরন্তন ধ্বনি—'তোমরা ভালোবাসবে, ক্ষমা করবে, ধৈর্য ধরবে, এবং আল্লাহর দিকে ফিরে যাবে।'

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আশিকুর রহমান সা'দী

শিক্ষার্থী:দারুল উলূম ঢাকা মিরপুর-১৩ ঢাকা

নবিজির শৈশব

জুবাইর আল হাদী

পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাঁদেরকে মানবজাতির হেদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি শুধু নবি নন, বরং তিনি মানবতার দিশারি, সকল নবিদের শিরোমণি এবং সকল যুগের জন্য চিরন্তন আদর্শ। তাঁর জীবনচরিত এমনই এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা যা পারিবারিক, সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয়-সব স্তরে অনুসরণের উপযোগী। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ মানবতার মুক্তির আলোকবর্তিকা।

আর সেই মহামানবের জীবন শুরু হয়েছিল এক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও আলোর ছোঁয়ায়। নবজাতক মুহাম্মদ সা. জন্মের পর তাঁর লালনপালনের জন্য হিজাজ অঞ্চলের এক প্রাচীন রীতি অনুসরণ করে তাঁকে দুগ্ধমাতার কাছে পাঠানো হয়। এতে শিশু একদিকে খোলামেলা প্রকৃতির মাঝে বেড়ে ওঠে, অন্যদিকে শুদ্ধ আরবি উচ্চারণে অভ্যস্ত হয়। মা আমিনার বুকের দুধ না থাকায়, শিশুটির দাদা আবদুল মুত্তালিব একজন পবিত্র ও সম্মানিত নারীর সন্ধানে থাকেন। অবশেষে বনু সা'দ গোত্রের সম্ভ্রান্ত মহিলা হালিমা আস-সাদিয়া (রাযি.)-কে পাওয়া যায়, যিনি শিশুটিকে নিজের কোলে তুলে নেন।

শিশু মুহাম্মদ (সা.)-কে গ্রহণের মুহূর্ত থেকেই হালিমার জীবনে আশ্চর্য সব পরিবর্তন আসতে থাকে। দুর্বল বাহন যেটিতে মক্কায় এসেছিলেন, সেটিই ফেরার পথে এত দ্রুত চলতে থাকে যে, অন্য সবাই অবাক হয়ে যায়। তাদের দরিদ্র সংসারে বরকতের ছোঁয়া লাগে-বকরীগুলো দুধে ভরে যায়, উটনীগুলো প্রাচুর্য নিয়ে ফিরে আসে। হালিমার স্বামী বলেন, “তুমি এক সৌভাগ্যবান শিশুকে ঘরে এনেছ।”

এই বরকতের গল্প শুধু খাদ্য-পানীয়েই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং গোত্রের অন্যরা যখন তাদের পশুদের একই জায়গায় চরাতো, তখনও তারা সেই বরকত থেকে বঞ্চিত থাকত। কারণ বরকত জায়গায় নয়, ছিল শিশুটির অস্তিত্বেই।

শিশু মুহাম্মদ সা.-এর আচরণ ছিল অন্যসব শিশুদের চেয়ে আলাদা। তিনি কখনো দুগ্ধপানের সময় উভয় স্তন থেকে একসাথে দুধ পান করতেন না-একটি নিজে নিতেন, অপরটি তাঁর দুধভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। এই আচরণ তাঁর শৈশবেই ন্যায়বোধ ও ইনসাফের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

হালিমা রাযি. আরও বলেন, মুহাম্মদ সা. উলঙ্গ থাকতে মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর শরীর ঢাকা না থাকলে তিনি কাঁদতে শুরু করতেন, আর শরীর আবৃত হলে শান্ত হয়ে যেতেন। তখন থেকেই হালিমা তাঁর দেহ সবসময় ঢেকে রাখতেন।

শিশুদের মধ্যে সাধারণত পবিত্রতার প্রতি যত্নশীলতা দেখা যায় না, কিন্তু নবিজি সা. সেই ব্যতিক্রম ছিলেন। হালিমা রাযি. বলেন, তিনি কখনোই নিজেকে অপবিত্র করতেন না, বরং সবসময় পাক-পরিচ্ছন্ন থাকতেন। এ যেন এক ঈশ্বরীয় পরিচয়, এক নুরানী দৃষ্টান্ত।

দুই বছর পার হওয়ার পর হালিমা তাঁকে তাঁর মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মক্কায় এক মহামারি দেখা দিলে, হজরত মুহাম্মদ সা. আবার হালিমার কোলে ফিরে আসেন। হালিমাও চাইতেন, তিনি যেন তাঁর সংসারে আবার ফিরে আসেন।

এর কিছুদিন পর ঘটে এক অবাক করা অলৌকিক ঘটনা-যা ইতিহাসে "সিনাচিরা" নামে পরিচিত। একদিন দুই ফেরেশতা এসে তাঁর বুক চিরে কলিজা থেকে এক অংশ বের করে তা জমজম কূপের পানিতে ধুয়ে আবার যথাস্থানে স্থাপন করেন। বলা হয়, এর মাধ্যমে তাঁর অন্তর পাপমুক্ত হয় এবং নূর দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এরপর নবিজিকে আবার তাঁর মা আমিনার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মায়ের সঙ্গে ছিলেন। একবার আমিনা সিদ্ধান্ত নেন ছেলেকে নিয়ে মদিনায় যাবেন, যেখানে স্বামীর কবরও ছিল। তাঁরা প্রায় ৫০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায় পৌঁছান, এবং এক মাস সেখানে অবস্থান করেন। ফেরার পথে 'আরওয়া' নামক স্থানে মা আমিনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

এইভাবে মুহাম্মদ সা. অল্প বয়সেই বাবা-মায়ের স্নেহছায়া হারান। অথচ এ বয়সেই একজন শিশুর সবচেয়ে বেশি দরকার হয় ভালোবাসা, আশ্রয় ও নিরাপত্তার। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য এমন এক পথ নির্ধারণ করেছিলেন, যা তাঁকে বিশ্ববাসীর নেতা হিসেবে গড়ে তুলবে-প্রতিটি মানুষের কল্যাণের পথপ্রদর্শক হিসেবে।
লেখা, জুবাইর আল হাদী,

শিক্ষার্থী, ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদরাসা, ঝালকাঠি সদর, ঝালকাঠি।

রাসুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী

দীপংকর কুমার চৌধুরী

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে আবির্ভূত হন আমাদের প্রিয়নবি হজরত মুহাম্মদ সা.। কুরাইশ শব্দের অর্থ মূলত বানিক বা সওদাগর। হজরত মুহাম্মদ সা. এর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতা আমিনা। দাদা আব্দুল মুত্তালিব। পিতৃহীন মুহাম্মদ এবং মা নাম রাখেন আহমাদ। মুহাম্মদ অর্থ, মূলত প্রশংসিত আর আহমাদ সর্বাধিক প্রশংসনীয়। তৎকালীন আরবের প্রথানুযায়ী মাতা আমিনার এক সপ্তাহ স্তন পান করার পড়ে তিনি আবু লাহাবের দাসী সুয়ায়বার স্তন পান করেন। তার পড়ে তাকে লালন পালনের জন্য বিবি হালিমার নিকটস্থ প্রেরণ করা হয়। পাঁচবছর তিনি ধাত্রী মাতা বিবি হালিমার কাছে ছিলেন। এ সময় মুহাম্মদ সা. জীবনে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে যায়। দুই ফেরেশতা এসে মুহাম্মদ সা. এর বুক বিদীর্ণ করে আন্তর আত্মাকে বাহির করে পরিশুদ্ধ করে দেন। তার পড়ে তিনি বনু সাদ গোত্রে বিশুদ্ধ আরবি শেখেন।

৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মাতা আমিনার মৃত্যুর পড়ে রাসূল অসহায় হয়ে যায়। তখন দাদা মুত্তালিব শিশু মুহাম্মদের দেখাশোনার দায়িত্ব নেন। কিন্তু ভাগ্য বিধাতা সহায় হয়নি। তিনিও ইন্তেকাল করেন ৫৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। এইভাবে মুসলিম জাতির দিশারি মুহাম্মদ সা. অল্প বয়সে মাতা - পিতা, দাদার স্নেহ ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন। এতিম মুহাম্মদ সা. এর দায়িত্ব নেন তার চাচা আবু তালিব। তিনি বালক মুহাম্মদ সা. কে নিয়ে লালন পালন করেন।

৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান চাচা আবু তালিবের সাথে। সেখানে সিরিয়া বাজারে বাহিরা নামে একজন খ্রিষ্টানের পাদ্রি মুহাম্মদ সা. এর চরিত্র দেখে তাকে ইঞ্জিলে বর্ণিত নবি হিসেবে আখ্যায়িত করেন। বাল্যকাল থেকে মুহাম্মদ সা. সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ, অভিমানহীনতা, উদারতা, ছিলেন। কমল ও সরলতার জন্য মক্কার বাসি সকলে তাকে পছন্দ করেন এবং ভালোবাসেন। সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা, আমানতের বিশ্বস্ত রক্ষাকারী, সরলতা, পবিত্রতার জন্য মক্কার মানুষ আল আমিন উপাধি দেন। (৫৭০খ্রি.) নবির জন্মের ১৫ বছর আগে বিবি খাদিজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খাদিজাতুল তাহিরা নামেও পরিচিত ছিলেন। মুহাম্মদ সা. এর

কর্মদক্ষতা তার উদারতা মন দেখে খাদিজা ৪০ বছর হয়েও ২৫ বছর মুহাম্মদ সা. কে বিয়ে করেন। খাদিজার গর্ভে তিন পুত্র এবং চার কন্যার জন্ম হয়।

অন্যদিকে খাদিজা তাঁর স্বামী হিসাবে মুহাম্মদ সা. এর প্রতি আন্তরিক ছিলেন। নবুয়তের দশম বছরে অর্থাৎ (৬১৯খ্রি.) ৬৫ বছর বয়সে এ মহীয়সী নারী পরলোকগমন করেন। নবুয়ত লাভের পড়ে মুহাম্মদ সা. গোপনে তাঁর আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে তাওহিদের আল্লাহ একত্ববাদ বাণী প্রচার করতে থাকেন। তার আহ্বানে প্রথমে বালক হিসেবে আলি রা. এবং প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হিসেবে হজরত আবু বকর রা. প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পড়ে আরও অনেক যুদ্ধারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এর পড়ে ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে মহান আল্লাহ ওহি প্রেরণ করে প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার নির্দেশ দিলে মহানবি সা. মক্কার মানুষকে পৌত্তলিকতা পরিহার করে এক আল্লাহর ইবাদত করতে বলেন।

তাওহিদের বাণী প্রচার করতে শুরু করলে প্রকাশ্যে। পৌত্তলিকতায় লিপ্ত সব গোত্র মুহাম্মদ সা. এর উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কুরাইশদের নিয়ে একটা সম্মেলন আহ্বান করেন পৌত্তলিকা থেকে বিরত থাকার জন্য। কিন্তু তার কথা তারা শুনল না। তাঁর উপরে অত্যাচার শুরু করে। তিন বছর তাদের মধ্যে বাণী প্রচার করে কোনো ফল পায়নি। কুরাইশের অত্যাচারে যখন চরম আকার ধারণ করে মুহাম্মদ সা. আল্লাহ নির্দেশে তাঁর শিষ্যদের নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেন। তার পড়ে তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

হিজরত শব্দটি আরবি, অর্থ হলো, দল বর্জন করা, প্রস্থান বা গমন করা । মক্কাবাসীর অমানবিক নির্যাতনের কারণেই তিনি মদিনায় হিজরত করে। তিনি মদিনায় ধর্ম প্রচার করে এবং তিনি সনদ লাভ করেন। তিনি আনেক যুদ্ধের সম্মুখীন হন। বিদায় হজ (৬৩২খ্রি.) মক্কা বিজয়ের পড়ে কিছুদিন মধ্যে পুরো আরবে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বিদায় হজের ভাষণে ১৬টি আল্লাহ বাণী প্রচার করে যান। তিনি প্রথমে বলেন এই বছরের পড়ে তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না।

এই বিদায় হজে তাঁর জীবনের ইতি টানা হয়েছে। তিনি সমাজে অনেক সংস্কার সাধন করে যান। দাস দাসী মর্যাদা দান, কন্যাসন্তান হত্যা বন্ধ ঘোষণা আরও নানান খারাপ কাজ থেকে বিরতি থাকার নির্দেশ দেন এবং সংস্কার করেন।

ইসলাম ধর্মের প্রাণ মহানবি হজরত মুহাম্মদ সা.। তিনি পৃথিবীর শেষ নবি ছিলেন। তাঁর অন্যতম গুন ছিল সত্যবাদিতা। ছোট্ট বেলা থেকে মিথ্যা বলা ঘৃণা করা এসব থেকে বিরত ছিল। মুহাম্মদ সা. নম্রতার মূর্ত প্রতীক। কখনো কাউকে আঘাত করে কথা বলেননি। কটু কথা বলেননি। মুহাম্মদ সা. অর্থনৈতিক সংস্কারে জোর দিয়েছিলেন। কুসীতপ্রথা, লুটতরাজ আর্থিক বৈষম্য দূর করে তিনি মুসলিম এর শরিয়ত মানে ব্যবসা - বাণিজ্যের ও আর্থ উপার্জনের নির্দেশ দেন। বিচার বিভাগের তিনি আনেক উন্নয়ন করেন। তিনি ন্যায়ভিত্তিক বিচারকার্য প্রবর্তন করেন। নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ সা. আনেক উদার ছিল। তিনি শেষ নবি হজরত মুহাম্মদ সা.। এরপর বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পড়ে মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

শিক্ষার্থী, জয়পুরহাট পাঁচবিবি হাজী মহসিন সরকারি কলেজে

মুহাম্মদের মিষ্টি দিনগুলো ﷺ

অনেক অনেক বছর আগের কথা। মরুর মাঝে ছড়িয়ে থাকা এক শহরের নাম ছিল মক্কা। চারদিকে পাহাড় ঘেরা সেই শহরে লোকজন থাকত, কাবাঘর ঘিরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকত। কেউ ছিল বণিক, কেউ যাযাবর। কিন্তু একটা দুঃখজনক বিষয় ছিল, মানুষ তখন এক আল্লাহকে ভুলে গিয়ে বহু মূর্তিকে পূজা করত। সত্য আর মিথ্যার ফারাক তারা বুঝত না। ঠিক তখনই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে পাঠালেন এক বিশেষ শিশু, যিনি হবেন সবার জন্য আদর্শ।

এই পবিত্র শিশুটির নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ﷺ, অর্থাৎ যিনি সবচেয়ে বেশি প্রশংসিত। তিনি জন্ম নেন রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে। সোমবার দিন। যা ইসলামের ইতিহাসে এক বিরল ও পবিত্র দিন।

তাঁর বাবা, আবদুল্লাহ। তাঁর জন্মের আগেই ইন্তেকাল করে যান। আর মা আমিনা, আদর-স্নেহে তাকে বড় করতে থাকেন। তবে খুব ছোট বয়সেই তিনি মাকে হারিয়ে ফেলেন। এরপর তাঁকে ভালোবাসায় আগলে রাখেন দাদা আব্দুল মুত্তালিব। কিন্তু কিছুদিন পর সেই দাদাও ইন্তেকাল করেন। এরপর তাকে নিজের সন্তানের মতো লালন করেন চাচা আবু তালিব।

শিশু মুহাম্মদ ﷺ-কে ছোটবেলায় আরবদের রীতিমতো গ্রামে পাঠানো হয় শুদ্ধ আরবি শেখার জন্য। তিনি গিয়েছিলেন হালিমা সাদিয়ার ঘরে। হালিমা ছিলেন এক দয়ালু নারী। আল্লাহর রহমতে, মুহাম্মদ ﷺ তাঁদের ঘরে এসেই যেন বরকতের বন্যা বইয়ে দিলেন। শুকনা মরুর মাঝে হালিমার উট দুধ দিত, বাচ্চা ছাগলগুলো দুধে ভরে যেত, আর ঘরজুড়ে শান্তির হাওয়া বইতে লাগল।

একদিন, শিশু মুহাম্মদ ﷺ মাঠে খেলছিলেন। হঠাৎ দুজন ফেরেশতা এসে তাঁর বুক ফাঁক করে অকলুষ হৃদয়কে জমজমের পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে দেন। তারপর তা ধুয়ে আবার আগের মতো রাখেন। যার ফলে হৃদয় শয়তানের কুমন্ত্রণা তিনি মুক্ত হয়ে যান। হালিমা ভয় পেয়ে যান। এরপর তাঁকে আবার মক্কায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

কৈশোর থেকেই মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন সত্যবাদী, আমানতদার এবং নম্র স্বভাবের। তাঁর বন্ধুরা খেলায় ব্যস্ত থাকলেও তিনি ছিলেন ভাবুক ও নির্জনপ্রিয়। মিথ্যা বলা, গালি দেওয়া কিংবা ঝগড়া করা তাঁর স্বভাবের ছিল না।

একবার বন্ধুরা তাকে বলল, চলো আমাদের সঙ্গে মেলার গান শুনতে চল। কিন্তু মুহাম্মদ ﷺ সেখানে পৌঁছে ঘুমিয়ে পড়লেন! এমনভাবে আল্লাহ তাঁকে পাপ থেকে রক্ষা করেছেন। তিনি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসার সফরে সিরিয়া যান। এই সফরে তিনি নিখুতভাবে দেখেন, কীভাবে সৎভাবে ব্যবসা

করা যায়। যৌবনে মুহাম্মদ ﷺ ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁকে সবাই বলত: 'আল-আমীন' যার মানে বিশ্বস্ত 'আস-সাদিক' যার মানে সত্যবাদী।

তাঁর সৎ ব্যবসায়িক চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে এক সম্ভ্রান্ত নারী, খাদিজা রা., তাঁকে ব্যবসার দায়িত্ব দেন। মুহাম্মদ ﷺ এতটাই সৎভাবে ব্যবসা করেন যে, খাদিজা রা. তাঁর প্রতি মুগ্ধ হয়ে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন নবিজির বয়স ছিল ২৫ বছর, আর খাদিজা রা.-এর বয়স ছিল ৪০। তাঁরা দুজন ছিলেন ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার এক অনন্য দম্পতি।

মক্কার শহরটা তখনও অন্ধকারে ডুবে ছিল। মানুষ মূর্তির পেছনে ছুটছিল, ভুলে গিয়েছিল এক আল্লাহর কথা। কিন্তু একজন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এসব দেখে খুব কষ্ট পেতেন। তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবিজি মুহাম্মদ ﷺ।

তিনি তখন চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছেছেন। শহরের কোলাহল থেকে দূরে তিনি চলে যেতেন হেরা গুহায়। সেখানে বসে চিন্তা করতেন, মানুষ কেন এত ভুল করছে? তারা কি জানে না, আল্লাহই আমাদের একমাত্র উপাস্য?

এক রাতে, যখন চারদিকে নিস্তব্ধতা, তখন হঠাৎ করে গুহার ভেতরে আলো ঝলমল করে উঠল। এক ফেরেশতা আসলেন জিবরাইল আ.। তিনি বললেন, 'পড়ো!'

নবিজি ﷺ ভয়ে কেঁপে উঠলেন, "আমি তো পড়তে পারি না! তখন ফেরেশতা আবার বললেন, তোমার প্রভুর নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন ...

এভাবেই তিনি পেলেন নবুওয়াতের উপহার। আল্লাহ তাঁকে মানুষকে সত্যের পথে ডাকার দায়িত্ব দিলেন। মক্কার লোকেরা নবিজি ﷺ-কে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। তাঁরা বলেছিল, তুমি কি আমাদের দেবতাদের বিরুদ্ধে কথা বলো?

অনেকেই তাঁকে কষ্ট দিত। তখন নবিজি ﷺ ভাবলেন, আসুন তায়েফের লোকদের কাছে যাই, হয়তো তারা সত্য বুঝবে। তিনি তায়েফে গেলেন। কিন্তু আফসোস! ওখানকার লোকেরাও তাঁর কথা শোনেনি। বরং তাঁকে পাথর ছুড়ে তাড়িয়ে দিল। তাঁর পা থেকে রক্ত ঝরছিল, শরীর ক্লান্ত ছিল, কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল ধৈর্যে ভরা।
এক বাগানে তিনি আশ্রয় নেন, আকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন, হে আল্লাহ! তুমি যদি আমার উপর রাগ না করো, তাহলে আমি এসব কষ্টকে কিছুই মনে করি না ...

আল্লাহ তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন আরও বড় দায়িত্ব দিয়ে। মদিনা শহরের মানুষগুলো নবিজি ﷺ-কে খুব ভালোবাসত। তারা চাইছিলেন তিনি যেন তাদের শহরে চলে আসেন।

মক্কার কাফের লোকেরা নবিজি ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। তখন আল্লাহর নির্দেশে নবিজি ﷺ তাঁর প্রিয় সাথি আবু বকর রা.-কে সঙ্গে নিয়ে হিজরত করলেন অর্থাৎ মদিনায় চলে গেলেন। এই সফরে তাঁরা থাকেন গুহায়, চলেন গোপনে, আর আল্লাহ তাঁদের রক্ষা করেন। মদিনায় পৌঁছে লোকজন আনন্দে বলল, 'চাঁদ এসেছে, চাঁদ এসেছে!' তাঁরা নবিজি ﷺ-কে বরণ করল গান গেয়ে; তালা আলা বাইনা... চাঁদ উঠেছে আমাদের মাঝে...

নবিজি ﷺ মদিনায় এসে প্রথমেই একটি মসজিদ তৈরি করলেন যার নাম হলো মসজিদে নববি। তিনি মুহাজির ও আনসারদের ভাই বানিয়ে দিলেন, সবাই যেন এক পরিবার হয়। তিনি মানুষকে বললেন, অন্যকে ভালোবাসো, অতিথিকে সম্মান করো, আল্লাহর ইবাদত করো তাহলেই জান্নাতে যাবে। মদিনা ছিল শান্তির শহর। নবিজি ﷺ সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করলেন, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ গড়লেন।

প্রিয় শিশুরা!
এই মহান নবিজি ﷺ ছিলেন মাতৃহীন, পিতৃহীন, কিন্তু কখনও অভিযোগ করেননি। তিনি সততার আলোয় নিজেকে গড়েছেন, তাই সবাই তাঁকে ভালোবাসত। তিনি আল্লাহকে কখনও ভুলে যাননি।
তোমরাও যদি সত্য বলো, ভালো কাজ করো, পবিত্র থাকো, বড়দের সম্মান করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরও ভালোবাসবেন।
নবিজি ﷺ-র শৈশব, কৈশোর ও যৌবন ছিল আদর্শের এক দীপ্ত প্রদীপ। তাঁর জীবন থেকে আমাদের শেখার আছে, কীভাবে কষ্টের মাঝেও সুন্দর চরিত্রে গড়ে ওঠা যায়। এ আলো তোমার আমার জীবনেও ছড়িয়ে পড়ুক।

মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন ইবনে মোস্তাফিজ
কাপ্তাই রাস্তার মাথা, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

কি এক নিদারুণ ব্যথা

চারদিকে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে, আকাশটাও যে আজ কাঁদছে খুব করে। নিজের সবকিছুকে উজাড় করে। এই ঝিরঝিরে আকাশের কান্না নাহয় একটু পরই থেমে যাবে, ধরনীর এই বিষণ্ন ভাবটা নাহয় একটু পরই কেটে যাবে, কিন্তু আমার মনের এই বিষণ্নতা তা কি আদৌ দূর হবে?
তাইতো মাঝে মাঝেই যখন নিজেকে বড্ড অসহায় মনে হয়, তখনই আমি যেন হারিয়ে যেতে থাকি কল্পনার জগৎ সেই ১৪০০ বছর পূর্বে।
যেখানে নেই কোনো কোলাহল, নেই হিংসাত্মক চিন্তাভাবনা, সেখানে সকলেই যেন একে অপরের জন্যই তৈরি, যখনই মনটা বিষণ্ন হয় তখন একাকিত্বে গুমরে মরতে হয় না। কারণ সেখানেও যে মাথায় হাত বুলিয়ে কেমন আছ তুমি জিজ্ঞেস করার মানুষ আছে। সবচেয়ে বড় কথা রাসুল সা. আছেন। এখনও পর্দার আয়াত নাজিল হয়নি।

তো একদিন মনটা আমার বড্ড খারাপ, অনেক ভাবনা মাথায় এসে ভিড় করছে, আর আমি বসে আছি এমনই এক মেঘলা দিনে আসরের নামাজের পর। আমি বসে আছি মসজিদে, যেখানে রয়েছেন আরও অনেক সাহাবি আর সকলের সামনে বসে বিভিন্ন জান্নাতি বাহারি বাহারি জিনিসের গল্প করছেন রাসুল সা.। সকল সাহাবীগন তা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, আর ভাবছেন কবে যাবেন সেই জান্নাতে?
ঠিক এমন সময় রাসুল সা. তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে উঠবেন, সকলে ভাবতে থাকবে কি এমন হলো যে, রাসুলুল্লাহ সা. এই বয়ান রেখে উঠে চলছেন সামনের দিকে? আমি তখনও অবনত মস্তকে বিভিন্ন ভাবনায় বিভোর থাকব। এমন সময়ই একজোড়া পা মুবারক দেখে আমি আমার অবনত মস্তকে একটু একটু করে উপরে তুলব, তখনই রাসুলুল্লাহ সা. আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলবেন, কি হয়েছে বিনতে কামাল? বড্ড মন খারাপ বুঝি, কি হয়েছে বলবে না আমায়?
তখনই আমি প্রিয় রাসুলের এহেন স্নেহপূর্ণ কথায় হু হু করে কেঁদে দেবো, আমি কাঁদতেই থাকব। আমার সকল কথা যেন গলায় দলা পাকিয়ে যাবে। তখনই আমার প্রিয় রাসুল সা. নরম সূরে বলবেন, কি হয়েছে বলো। শুনি কীসের জন্য আজ বিনতে কামাল সেই শুরু থেকেই অন্যমনস্ক ছিল। তখন আমি এই খুশিতে আবারও কেঁদে দেবো যে, রাসুল সা. আমার প্রতি সেই শুরু থেকে দৃষ্টি রেখেছিলেন। আমি আমার ভাঙ্গা কণ্ঠে আবারও বলব ফিদাকা আবী ওয়া উম্মি ইয়া রাসুলুল্লাহ। এরপরই আমি আমার সকল ভাবনাকে তুলে ধরব। আমার হাবিবের কাছে, সব শুনে তিনি বলবেন এই তবে তোমার কান্নার কারণ। আমি তখনই ছোট্ট বাচ্চাদের মতো মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে বলব, আমি তো মারা যাব ইয়া রাসুলুল্লাহ আর হিসাব নিকাশের জন্য তো আমায় সেই কিয়ামত পর্যন্ত সেই অন্ধকার কবরে কীভাবে থাকব?
যেখানে কি-না এক প্রহর আপনার মুখের সেই অতুলনীয় বাক্য মালাগুলো না শুনলে আমার দমবন্ধ হয়ে যায়।
তখন রাসুল সা. আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেবেন, যার কারণে তার ঝলমলে দান্দান মুবারক বের হয়ে শুভ্র আলো ছড়াবে, তখন তিনি দু-হাতকে আসমানের দিকে উঠিয়ে আমার নাম ধরে দোয়া করে বলবেন, আল্লাহ বিনতে কামালের কবরের অন্ধকার দূর করে আলোকিত করে দেন। সুবহানাল্লাহ
এরপর প্রিয় রাসুলুল্লাহ সা. আবারও আমার দিকে ফিরবেন এরপর বলবেন এখনও কীসের চিন্তা তোমার হে বিনতে কামাল।
যেখানে কি না আমি নিজ হাতে কেয়ামতের দিন তোমাকে হাউজে কাওসারের পানি পান করাব। সুবহানাল্লাহ।
সকল সাহাবা সাহাবিয়ায়ে কেরাম তখন খুশিতে আপ্লুত হয়ে আল্লাহু আকবর জয়ধ্বনি দেবেন। আর আমার রাসুলও আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসি দেবেন।

কিন্তু নাহ ইয়া রাসুলুল্লাহ এমনটা যে হওয়ার না, না আমি আপনার যুগে জন্ম গ্রহণ করতে পেরেছি, আর না আপনাকে দেখে সাহাবিয়া হওয়ার মর্যাদা অর্জন করেছি। আর না আপনার সফরের সঙ্গী হতে পেরেছি, আর না বসতে পেরেছি আপনার সেই মন ভোলানো নসিহতের মজলিসে।
আর না আপনি আমায় দিয়েছেন এমন একটি সুসংবাদ, তাই যখনই এমনটা মনে পড়ে যে, এইসবই এক নিছক কল্পনা তখনই যেন আমি অনুভব করি আমার অন্তরে কি এক নিদারুণ ব্যথা। তবে আপনি বলে দিয়ে গেছেন যে, আপনার বাতলানো পথে চললে আমরা অনেক পুরস্কার পাবো। ইনশাআল্লাহ আমরা আপনার বাতলানো পথেই চলবো।

বিনতে কামাল হোসাইন
ছাত্রী

আপনাকে ভালোবাসি ইয়া রাসুলুল্লাহ!

আপনাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছে। নয়ন ভরা তন্ময় নিয়ে আপনাকে দেখার অপার ইচ্ছাগুলো আবিষ্ট করে নিচ্ছে আমার সমস্তটা। মন-মানসের বিশ্বজুড়ে নিষ্কলুষ প্রণয়ের আকাশচুম্বী মিনার। সেখানে নিরন্তর অনুরণিত আপনার মুবারক পদধ্বনি। আপনার পদভার, আপনার ঘোড়সওয়ার; সবকিছুই আমার খরতপ্ত হৃদয়ের সঞ্জীবনী সুধা। ব্যথিত হৃদয়ের একমাত্র উপশম কল্পনার কল্পিত আপনিই। যেন কেউ নির্ভার পায়ে পাড়ি দিচ্ছে ধুধু মরুভূমি। সূর্যের রুক্ষতারা সলজ্জ চরণে ত্বরা খুঁজে নিচ্ছে পুরু প্রস্তর মেঘের আড়াল। কেউ একজন কথা বলছে। আদিগন্ত বিস্তৃত সাহারার বুকে ক্ষণজন্মা ফুল সন্ধানী কথামালা। যে ফুলের শাশ্বত মোহন ও মধুরতা ছাপিয়ে যাবে সমুদ্র বহুতলও। ছুঁয়ে যাবে আকাশ মহাকাশেরও অন্তস্তল। কেউ একজন হাসছে। সেই মুচকি হাসির ওষ্ঠাধর গলে প্রস্রবণের মতো নেমে আসছে স্বর্গীয় বিভার বিপুল বিচ্ছুরণ। গোটা জগৎ তখন বিভোর, আড়ষ্ট ও আচ্ছন্ন। দ্বাদশী চাঁদের নিয়ন আলোরাও ঠিকরে পড়ছে তার চক্ষুজ্যোতির সীমা চুয়েচুয়ে। কী বিস্ময়কর সৃষ্টির আশ্চর্য মহিমা! সৌন্দর্যের কী অনিন্দ্য নৈপুণ্য! কী অনির্বচনীয় গুণগরিমার সমূর্ত প্রতীক। কবি যথার্থই বলেছিলেন ,

وأُحسن منك لم تر قط عيني * وأُجمل منك لك تلد النساء
خلقت مبرءً من كل عيب * كأنك قد خلقت كما تشا

এই নিখুঁত নিষ্কলুষ সৃষ্টির মহামানব আপনিই না ইয়া রাসুলাল্লাহ? আপনিই তো না? দেখুন, কী অবাধ্য চোখের অশ্রুগুলো! এতক্ষণ কোন রাও-সাড়া নেই। যেই বললাম " ইয়া রাসুলুল্লাহ "এমনিই যেন বালুর বাঁধ ভেঙে হু হু করে নেমে আসছে বানের জল হয়ে। আমি আপনাকে ভালোবাসি ইয়া রাসুলুল্লাহ! অনেক অনেক ভালোবাসি। অনেক। হয়তো আবু বকর ওমরের মতো হবে না, কিন্তু যতটুকু বাসি ওই টুকুন ভালোবাসাও যদি আটকে রাখি বুকের ভেতর, অশ্রু হয়েও ঝরতে না দিই কোনদিন, তাহলে ফুসফুস ফেটে একদিন মরেই যাব ইয়া রাসুলুল্লাহ। ইয়া রাসুলুল্লাহ, আমি আপনাকে দেখার তৃষ্ণায় কাতর। সাগর বুকেও তৃষ্ণা জ্বালাতে পারে এমন সম্মোহনী তৃষ্ণা। আর আপনিই আমার সেই তৃষ্ণা। আপনিই তার উপাদেয় একমাত্র নিবারক।

জানি, অমোঘ নীতির কোন মাহেন্দ্রক্ষণে স্বর্গীয় কোন পটভূমিতে সাক্ষাৎ হবে আমাদের। তখন আশু কর্তব্য ঠিক করতে হিমশিম খেয়েই যাব কি না! তবুও আমি চাতক বনে অপেক্ষমাণ অবশ্যম্ভাবী অনাগত ওই সময়ের জন্য। কারণ, জগতকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ মানরের ললাট চুমে, দরিয়ার মতো বুকে একটু ঠাঁই খুঁজে নিয়ে বিস্মায়নের দ্রবীভূত কণ্ঠে শুধু বলতে চাই - ফিদাকা আবি ও উম্মি ইয়া রাসুলুল্লাহ! ফিদাকা আবি ও উম্মি ইয়া রাসুলুল্লাহ!!

রাকিব আলগাজী

শিক্ষার্থী , জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দিলুরোড , মগবাজার , নিউ স্কাটন ঢাকা

ফিদাকা ইয়া সায়্যিদানা

মুহাম্মাদ, কত সুন্দর একটি নাম। এ নামের চারিপাশে সবসময় ফুটে থাকে অসংখ্য দুরুদফুল। মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলতে থাকে। কী দারুণ গড়ন ও রং! আমাকে অবাক হতেই হয়। মুহাম্মাদ মুহাম্মদ মুহাম্মদ-প্রেমের তাসবিহ হাতে জপি। বাতাসে গুঞ্জন তোলে- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুর। এই স্নিগ্ধ সুর যতদূর যায়, ছড়িয়ে পড়ে অদৃশ্য প্রশান্তির জাল।

মুহাম্মাদ; আমাদের মহান নেতার নাম। যে নেতার আদর্শ বুকে ধারণ করে প্রতিটা কদম ফেলতে চেষ্টা করি। তিনি এমন নেতা- যার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেনি কেউ কোনোকালে। যার চলন বলন আচার ব্যবহার মুগ্ধ করেছে সবাইকে। তার সাথে কাটানো মুহূর্তগুলোকে নির্দ্বিধায় বলা যায় জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্ত। কিন্তু আফসোস- কখনো দেখিনি তাঁকে। হৃদয় আমার কত যে আকুতি করে; একবার স্বপ্নলোকে হলেও তাঁকে দেখার জন্য। মুগ্ধতাভরে দু'চোখে দেখতে পেলে তাঁকে-ধন্য হতো জীবন।

ভাবছি- নবিজি আমাদের জন্য কতটা কষ্ট সহ্য করেছেন। আমাদের মুক্তির জন্য কতটা ব্যাকুল ছিলেন তিনি। তিনি কাঁদতেন আমাদেরকে ভেবে। কাঁদতে কাঁদতে ভিজে যেত তাঁর দাড়ি মুবারক। ভিজে যেত তাঁর বক্ষ মুবারক। তিনি বাইতুল্লাহ প্রাঙ্গণে কেঁদেছেন। মিনায় কেঁদেছেন। আরাফায় কেঁদেছেন। মধ্যরাতে কেঁদেছেন। শেষ রাতে কেঁদেছেন। তাঁর কান্নার কিন্নর সুর পৌঁছে যেত আকাশের স্তরে স্তরে। পৌঁছে যেত আরশে আজিমে। মুহাম্মদে আরাবী কেঁদে কেঁদে বলতেন- দয়াময়! ইবরাহিম আলাইহিস সালাম বলতেন, ক্ষমা করো। ঈসা আলাইহিস সালাম বলতেন, মাফ করো। তাদের সেই সুরের রেশ ধরে আমিও আর্জি জানাচ্ছি- আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও! ভাবছি- জীবনে একখানা প্রেমপত্র লিখব। যে প্রেমপত্রের প্রতিটা বর্ণ চুঁইয়ে গলে গলে পড়বে হৃদয়ের অনুভূতি। কিন্তু কী লিখব তাতে! অতিরিক্ত আবেগ বিবেককে স্তব্ধ করে দেয়। জমে যেন বরফ হয়ে যায় সব। তবে আমাকে যে লিখতেই হবে সে পত্রে। অন্তত একটা বাক্য হলেও আমাকে লিখতে হবে। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে হলেও আমি লিখব-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মসজিদে নবাবীর প্রাঙ্গণে তো নামে কত কবুতরের স্রোত। কত শত কবুতর সেথায়! একটা কবুতর কি পথ ভুলে আসতে পারে না আমাদের বাড়ি? একদিন মসজিদে নবাবীর একটা কবুতর পথ ভুলে চলে এলো আমাদের বাসায়। বসল ব্যালকনির গ্রিলে অথবা ছাদের মেঝেতে। আমার চোখ দুটো ভরে উঠল আনন্দে। মেহমানের জন্য উপস্থিত করলাম ধান, গম, সরিষা এবং অন্যান্য দানা। আলাদা আলাদা রঙের আলাদা আলাদা পাত্রে। একটি পাত্রে পানিও দিলাম। পেটভরে নয়, প্রাণভরে খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করল কবুতরটি। তারপর ডেকে উঠলে-বাক-বাকুম। আমি যেন তার ভাষা বুঝতে পারলাম। মদিনার কবুতর ফিরে যেতে চাইছে তার দেশে। আমি খুব আবদার করে বললাম, একটু দাঁড়াও না! আমি ঘর থেকে এক্ষুনি আসছি।
তারপর ঘরে গিয়ে একটুকরো নীল কাগজে লিখে নিলাম দীর্ঘতম একটি দরুদ। বেঁধে দিলাম কবুতরের পায়ে। এরপর উড়ে গেল সে। যাওয়ার সময় তার কোমল গতর থেকে একটা পালক খসে পড়ল। যেন ইচ্ছে করেই দিয়ে গেল আমাকে। আর আমি পরম যত্নে তুলে রাখলাম...

নিঝুম দ্বিপ্রহর
ছাত্র, মাসনা মাদরাসা, যশোর

মহামানব

আফরোজা সুলতানা

বলছি এক মহামানবের কথা-
শতাব্দীর রঙিন পোস্টারে যার কীর্তি রয়েছে গাঁথা।
যার আগমনে জাহিলিয়াত হয়েছে দূর,
সোনালী সমাজ হয়েছে বিনির্মাণ।

জানো কি? কেমন ছিলো তাঁর জীবনাচার?
বেড়ে উঠেছেন মরুর বুকে,
ইয়াতিম হয়ে দুঃখের সাথে,
নবী হয়ে শুনেছেন গালি, শত অপপ্রচার।

তাঁর পথে কাঁটা বিছাতো যে জাতি,
তাদের প্রতি ফুল করেছেন বর্ষণ।
তাঁর গায়ে আবর্জনা ছিটাতো যারা,
তাদের করেছেন সুবাসিত।
পাথরের আঘাতে যারা করেছে রক্তাক্ত
করেননি তাদের অভিশপ্ত।
কাটিয়েছেন তিনটি বছর বরণ করে বন্দিত্ব। ছেড়েছেন
মাতৃভূমি হয়ে ইলাহী আদেশপ্রাপ্ত অসহনীয় যন্ত্রণাপ্রাপ্ত হয়ে
ও বলেছেন তিনি
অভিযোগ নেই কোনো; তোমরা সবাই মুক্ত।
ভেবে দেখেছো কভু? এ কী এক অনুপম জীবনদর্শন!

শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম কলেজ। পটিয়া, চট্টগ্রাম

নবীর দিদার

আশরাফ বিন হানিফ

আমি কাঁদি একা বসে নিরালায়,
কবে যাবো আমার নবীর রওজা মদিনায়।
যে মাটিতে শুয়ে আছেন নবিদের সরদার,
তাঁর দিদার চাই যে, আমি স্বপ্নে একবার।

যদি আমি পাখি হয়ে উড়তে পারতাম,
হয়তো মদিনার রওজা দেখে আসতাম।
জমজমের পানি খেয়ে মনটা জুড়াতাম,
হাজরে আসওয়াদে গিয়ে চুমু খেতাম।

মহান প্রভুর কাছে আমি কাঁদি বারেবার,
জান্নাতের পথে যেন পাই তাঁহার দিদার।
পুলসিরাতের কঠিন দিনে দিয়ো গো বাঁচার উপায়,
তোমার শাফায়াত ছাড়া গতি যে আমার নাই।

শিক্ষক, জামিয়া দারুল কোরআন মিনাপাড়া। জকিগঞ্জ, সিলেট।

মহানবী ও বুড়ি

খোন্দকার হুমায়ূন কবীর

কোথায় যাবে গো বুড়ি মা এমন বোঁচকা পুঁটুলি নিয়ে
আমাকেই দাও আমি এই বোঝা দিয়ে আসি পৌঁছিয়ে।

এই বলে তিনি বোঝাটা নিলেন বুড়ি চলে পিছু পিছু,
এত ভালো লোক মক্কায় আছে ভাবতে পারে না কিছু।

প্রকৃত ঘটনা মুসলমানের মক্কা বিজয় হলে,
চারিদিকে থেকে মুসলিম আসে স্বভূমিতে দলে দলে।

বিপরীতে যত পৌত্তলিকেরা পালায় মক্কা ছেড়ে,
শঙ্কা তাদের প্রতিপক্ষরা হত্যায় আসে তেড়ে।

বুড়ি ছিল সেই পলায়নরত পৌত্তলিকের দলে,
চলেছে দূরের আশ্রয়ে কোনো নিরাপদ অঞ্চলে।

যেতে যেতে পথে লোকটি শুধান কোথায় তোমার বাস
বুড়ি বলে, আগে তাড়াতাড়ি চলো নইলে সর্বনাশ।
জানোনা তুমি কি আব্দুল্লাহার পুত্র মোহাম্মদ,
মক্কার দিকে ধাবিত হচ্ছে করবে এখনই বধ।

বলতে বলতে বুড়ি যায় হেঁটে লোকটা শোনেন সব,
তখন সন্ধ্যা মরুপাখিদের থেমে গেছে কলরব।

একটা বাড়ি কাছে আসতেই বুড়ি বলে, থামো ভাই
তুমি খুব ভালো, কিন্তু তোমার নাম শোনা হয় নাই।
বুড়ি আরো বলে, মোহাম্মদ খুব হিংস্র ও দুর্জন
নতুন ধর্মে দীক্ষিত তার শিষ্যও অগণন।

তিনি হেসে কন, আমি সেই লোক মোহাম্মদ নাম যার,
আব্দুল্লাহর সন্তান আমি অধিবাসী মক্কার।

একথা শুনে বৃদ্ধার যেন কপালে উঠল চোখ
বলে, হায় তুমি এত ভালো, তবু বদনাম করে লোক।

তুমি সত্যিই মহান উদার সত্যনিষ্ঠ নবী,
তোমাকে যারা অপবাদ দেয় অমানুষ তারা সবই।
বলে, হে রাসুল ক্ষমা করে দাও, কী ভুল করেছি আমি
আজ থেকে আমি মুসলিম নারী কসম অন্তঃযামী।

সত্যের দিপ্তী

মাহফুজ উল্লাহ তৈয়ব

কা'বার কোলে ফুটল চাঁদ, থেমে গেল কুফর-অভিনয়,
নূরের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল, বিশ্ব পেল শান্তির আবয়।
হালিমার কোল জুড়ালো আলো, মমতার এক নবীন দীপ্তি,
বক্ষ বিদীর্ণ করে এল ফেরেশতা,দান করলো নূরের নিক্বি।

হেরা গুহায় নির্জন রজনী, এলো 'ইকরা'র প্রথম হুকুম,
সিদরাত ছুঁয়ে উঠল উম্মত, জাগল দীনের সোনালী কুম।
মদিনার বুকে গড়ল উম্মাহ, ভাইয়ে ভাই মিলল প্রাণে,
নবুয়তের আলো ছড়ালো বিশ্বে, একতা গাঁথা শান্তির বাণে।

বদরে ঝরল ঈমানের জোয়ার, উহুদের পাহাড়ে কাঁপল বুক,
খন্দকের মাটিতে কৌশল আঁকা, হুদায়বিয়ায় বরসে সুখ।
মক্কা বিজয়ে চূড়ান্ত ক্ষমা, দুঃখ দিলেন ভালোবাসায়,
আরাফার ময়দানে বললেন "তাকওয়া মুক্তির মহাশঙ্খ
বাজায়"।

রাত্রির আঁধারে কাঁদলেন যিনি, উম্মতের জন্যে ভিজল গাল,
ভালবাসা যার হৃদয় ছুঁয়ে সাহাবীর হৃদয় করল ডাল।
চলে গেলেন, নূর নিভে গেল, তবু রেখে গেলেন দীপ্ত
সিরাত,
তাঁর পাঠই দিশা দেবে, যতদিন থাকবে দুনিয়ার হাত।

শিক্ষার্থী, জামিয়া আরাবিয়া ইসলামিয়া জিরি চট্টগ্রাম।

এক টুকরো শাফায়াত

হাবীবুল্লাহ মাহমুদ

যে নামের রব উঠে মুনতাহার মুসল্লায়
নিরব সাধকের দরুদে আঁকা সে মধুর প্রেম মায়ায়,
তোমাকে খুঁজি হে মুহাম্মাদে রাসুল (ﷺ)
ঠাঁই দিয়েছি তোমায় আমায়তর অস্তিত্বের বিছানায়।

পুষ্প মাথায় প্রজাপতির নিষ্কলুষ ছোঁয়া
প্রেম বুকে জাগে নাবিক; হাঁকে দরিয়ার খেয়া,
সে প্রেম-কবিতার পঙতি তুমি হে আরাবী
তোমারী তরে ভীরে লক্ষ কোটি সালাম-দুআ।

ইশক্বের মিছিলে মাজনুন সাগর মৎস
সৃষ্টি কুলে ব্যাকুল হওয়া ছোট শিশুর ভাষ্য,
সে আবেগ গোধুলীতে মিশ্রীত হয় হে নাবী
সদা প্রণয়ের সুঁতোয় গাঁথি রওজা পাকের দৃশ্য।

তব নামে শিহরিত মন হে নবীয়ে সালতানাত
স্বপ্ন দিদারের লালসায় কেঁদেছি কত মুনাজাত,
শুধু অন্ধ মজনুর মত জপে গেছি দরুদ
ময়দানে মাহসারে খুচরো দিও "এক টুকরো শাফায়াত"

সায়্যিদুল মুরসালিন

সাদিয়া আনজুম

সেদিন ধরার বুকে পরিত্রাণের আলো নিয়ে এসেছিলেন
সুমহান সায়্যিদুল মুরসালিন মুহাম্মদ (সা.),
মরমরে বৃক্ষ বাগানে অপূর্ব পুষ্পের
নবোদয়ে নন্দিত জাহান।

তমোময় পৃথিবী আঁধারে নিষুপ্ত
প্রিয়মাণ প্রকৃতি নিস্তব্ধতায় প্রসুপ্ত,
দিগন্ত থেকে ছুটে আসা উদ্দীপ্ত নূর
যার আগমনে সব আঁধার হলো দূর।

শামের অট্টালিকাগুলো আলোকিত করেছিল
পারস্য সম্রাটের পাথরের গম্বুজ ভেঙে পড়েছিল,
অগ্নি উপাসকদের জ্বালিয়ে রাখা আগুন নিভে দিয়েছিল
খরস্রোত মাওয়া সাগর হঠাৎ শুকিয়ে গিয়েছিল।

প্রিয় নবীর আগমনের বার্তায়
পুলকিত পৃথিবী নানান আশ্চর্য রঙ মেখেছিল,
অলৌকিক নিদর্শনে অতিমুগ্ধতায় নক্ষত্র সেজেছিল,
মুসলিম উম্মাহ সেদিন শ্রেষ্ঠ নবীকে পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন
করেছিল।

সবুজ মিনার

মানসী খাতুন

দোজাহানের স্রষ্টা তব সৃজিলেন ভালোবেসে
যার আগমনে নূরের ছটা ধরায় এলো নেমে,
আসমান জমিন ভরে গেলো ফুলের খুশবুতে
ঘুচলো জুলুম, ঘুচলো ভ্রান্তি নতুন আলোতে।

স্বপ্নে বিভোর দূর মাদিনায় হাঁটবো খালি পায়ে
নয়ন জুড়ে দৃষ্টি থাকবে ঐ সবুজ মিনার গায়ে,
যদি হতাম ডানা মেলা পাখি, দুরুদ হতো বুলি
হতাম যদি ঐ সবুজ মিনারে রং মাখানো তুলি।

ক্বালব জুড়ে আবেগ আর এশক্বে মোহাব্বাত
কণ্ঠে যেন গুনগুনানি প্রিয় নূর নবীজীর নাত,
বসতাম গভীর অনুরাগে, যেথা শান্তি-সুকুনাত
ঐ মরুর বুকে বসে বৃষ্টিস্নানে মাখতাম রাহমাত।

শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

কেমন ছিলেন তিনি ﷺ

কাজী সুলাইমান মুহাম্মাদুল্লাহ

কেমন ছিলেন আমার নবী
কেমন ছিলেন তিনি?
পূর্ণতাতে ঐশী নূরের
মশাল ছিলেন যিনি!

কেমন ছিলো আমার নবীর
কৃষ্ণ চোখের তারা?
যার মায়াবী চোখের চাওয়ায়
বিশ্ব পাগলপারা!

কেমন ছিলেন আমার নবী
কেমন তাঁহার মুখ?
যে মুখ দেখে ভুলতো সবাই
দুর্দশা আর দুখ!

কেমন ছিলো আমার নবীর
শুভ্র দাঁতের হাসি?
মুক্তঝরা যেই হাসিতে
মুগ্ধ জগতবাসী

কেমন ছিলেন আমার নবী
কেমন তাঁহার ঘ্রাণ?
যে ঘ্রাণ মেখে ফুল বাগিচার
ফুল পেয়েছে প্রাণ!

কেমন ছিলো আমার নবীর
মুখের কোমল ভাষা?
যেই ভাষাতে নিঃশ্ব প্রাণেও
জাগতো নতুন আশা!

কেমন ছিলেন আমার নবী
কেমন তাঁহার রূপ?
যার ঝিলিকে পূর্ণিমা চাঁদ
নিস্প্রভা নিশ্চুপ!

তাঁর তুলনা নিজেই তিনি
আঁকবে কে তাঁর ছবি?
তাঁর সুরতের বর্ণনাতে
ব্যর্থ সকল কবি।

শিক্ষক ও কবি

ওই মদিনার পানে

মো. জাহাঙ্গীর আলম

কেমনে বলি ভালোবাসি
কবিতা আর গানে,
মন যে আমার পড়ে থাকে
ওই মদিনার পানে।

যতই তুলি কণ্ঠে আমার
মুগ্ধ মধুর সুর,
কবে যাবো রওজাপাকে
পথ যে বহুদূর।
তাইতো আমি মিশে থাকি
নূর নবিজীর ঘ্রাণে।।

যতই আঁকি ছন্দ সুরে
ওই মদিনার ছবি,
কাছে থেকে ছুঁয়ে দেখা
এই জীবনের হবি।

সুরে সুরে যাই গো বলে
মনের কথামালা,
যতই বলি যতই লিখি
মিটে নাতো জ্বালা।
ওই মদিনা মিশে আছে
আমার মন-প্রাণে।

ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম।

নবির সা. পরশ

নজমুল ইসলাম খসরু

প্রিয় নবীর পরশ পেয়ে
উঠলো জগত হেসে,
জীবন বাজি রাখেন তিনি
মোদের ভালবেসে।

জাহিল যুগের অন্ধকারে
আলোর মশাল হাতে,
লড়ে গেলেন শত শত
বাতিল মতের সাথে।

সাহাবীরা জীবন দিলেন
ঝরলো নবীর রক্ত,
বিজয় হলো ইসলামেরই
আমরা তারই ভক্ত।

সত্য পথের দিশা দিলেন
বাতিল হলো সবই,
মানবতার মুক্তির দিশা
মোদের প্রিয় নবি।

নবীর শানে আঘাত এলে
প্রতিবাদে এক হই,
ঈমান নিয়ে গর্জে ওঠে
নিত্য জেগে রই।

ভক্তি করি সালাম জানাই
রাখি হৃদয় মাঝে,
এই নামেতে দুরুদ পড়ি
সকাল-দুপুর-সাঁঝে।

দক্ষিণ সুরমা, সিলেট

ভালোবাসি প্রিয় নবি সা.

সাইফুল্লাহ ইবনে ইব্রাহিম

হাজার-কোটি দরুদ-সালাম প্রিয় তোমার তরে,
ভালোবাসি প্রিয় নবি তোমায় হৃদয় ভরে।

দূর মদিনার সবুজ ছায়ায় শুয়ে আছো জানি
আশায় আছি, যেদিন হবে প্রভুর মেহেরবানি
ছুটে যাব ওই মদিনায় সবুজ ছায়ার কাছে
তোমার চেয়ে আর দরদি কে বা কোথায় আছে!

দীনের তরে অকাতরে সয়ে গেছ কষ্ট,
ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে পষ্ট।

তুমি ছিলে উম্মাহ-প্রেমী, এই ফিকিরে মগ্ন,
শাফায়াতের করছি আশা, কোরো না তা ভগ্ন।

সদর, ময়মনসিংহ

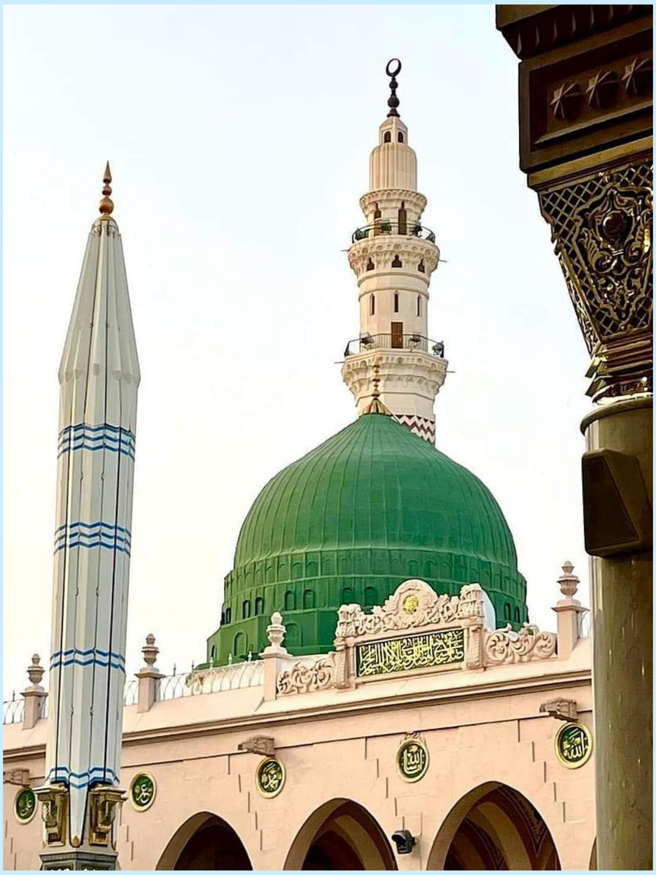

নবীর শুভাগমন

মুহাম্মাদ বিন আনাস

হঠাৎ যে ঐ বইল নহর ঊষর মরুতে,
সজীব তারই লাগল ছোঁয়া কানন তরুতে।

নতুন ভাবের আমেজ নিয়ে গাইছে পাখি গান,
গুল বাগিচায় ফুল কলিরা ছড়ায় মধুর ঘ্রাণ।

সাগর কোলে ঢেউ খেলে যায় নতুন উচ্ছাসে,
নতুন তেজে উঠল রবি ভোরের পুর্বাকাশে,

শোনো শোনো দ্বীনের নবী এসেছেন ধরায়,
খুশিতে তাই নিখিল জগৎ শুভেচ্ছা জানায়।

বছিলা, মোহাম্মদপুর

হতাম যদি পাখি

ইবনুল হাফিজ তানভীর

পাখনা মেলে উড়ে উড়ে
ঝাঁপটা ফেলে যেতাম দূরে
আনন্দে আর আতিশয্যে
মেলে দুটি আঁখি,
হতাম যদি পাখি।

প্রথম যেতাম সুদূর কা'বায়
প্রাণের নবীর জন্ম যেথায়
জিয়ারতে কা'বা নিতাম
সাদা পোশাক মাখি,
হতাম যদি পাখি।

সেথা হতে পাখম মেলে
দূর মদিনায় দৃষ্টি ফেলে
দিতাম উড়াল ফের আবারো
দুরুদ মুখে রাখি,
হতাম যদি পাখি।

রওজাপাকে সালাম দিতাম
মদীনার ঐ সুবাস নিতাম
সাহাবারা আতর ভেবে
যে ঘাঁম নিত মাখি!
হতাম যদি পাখি।

জান্নাতুল বাকির কবরগুলো
দেখার বড় ইচ্ছা ছিলো
প্রতিক্ষণে বসে সেসব
স্বপ্ন আমি আঁকি,
হতাম যদি পাখি।

কা'বার মালিক কবুল করো
মনো-বাসনা পূরণ করো!
প্রতি দোয়ায় যেসব আকুল
আবদার আমি রাখি.!
হতাম যদি পাখি।

নবির প্রেমে

ছাবিলা ইয়াছমিন

নবীর প্রেমে লিখবো ছড়া
ভালোবাসা দিয়ে,
সেই ছড়াটা লিখবো আমি
সবুজ গম্বুজ নিয়ে।

নবীর প্রেমে লিখবো ছড়া
সালাম দিবো তাতে,
সেই ছড়াটা লিখবো আমি
একা নির্ঘুম রাতে।

নবীর প্রেমে লিখবো ছড়া
মনের খাতা জুড়ে,
সেই ছড়াটা লিখবো আমি
নিত্য নতুন সুরে।

নবীর প্রেমে লিখবো ছড়া
তাকে আপন করে,
সেই ছড়াটা লিখবো আমি
জনম জনম ধরে।

সালাম দরুদ

শাহানারা বেগম ইমা

যতো আলো তারা চাঁদে যতো ফুল গাছে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মেঘে মেঘে যতো ঘর্ষণ,
তার চেয়ে লাখো গুণ সালাম দরুদ
রাসূলের উপর হে প্রভু, করো বর্ষণ।

রাসূলকে পেয়ে আরব ও অনারব
মেখে নিয়েছে যেন জান্নাতি সৌরভ,
নসিব হয়েছে সবার সুপ্রসন্ন
তাঁর তরে কুরবান হোক এ জীবন।

রাসূলের সাহাবা পরিবার স্বজন
যারা তাঁর আদর্শ নীতির অনুসারী,
তাঁদের উপর তুমি ঝরাও অঝোরে
করুণার ঢল আর রহমের বারি।

রাসূলকে পেয়ে পৃথিবীর ধূলো মাটি
হয়েছে যেন উর্বর সোনামাখা খাঁটি,
দিকে দিকে জন্মেছে ঈমানের চারা
তাঁর পথে তাঁর মতে রেখো আমরণ।

লেখক ও শিক্ষক

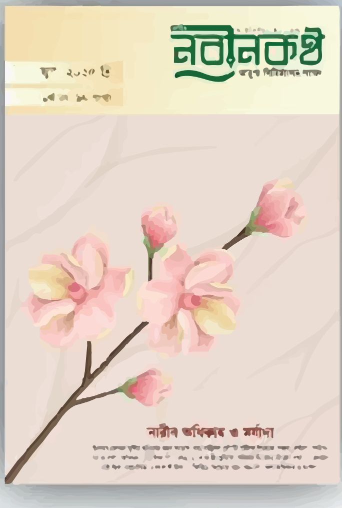

লেখক পুরস্কার

মাসিক নবীনকণ্ঠ
তারুণ্য বিনির্মাণের লক্ষ্যে

নারীর অধিকার ও মর্যাদা

মাসিক নবীনকণ্ঠ জুন-২০২৫ খ্রি. এর 'নারীর অধিকার ও মর্যাদা' সংখ্যায় যে পাঁচজন সেরা লেখক/লেখিকা নির্বাচিত হয়েছেন:

১. মাহফুজ বিন মোবারকপুরী–*নারীমুক্তির আন্দোলনে ইসলাম (প্রবন্ধ)*
২. জামাল হোসেন–*আমার দেহ আমার ইচ্ছে (ফিচার)*
৩. শাহানারা বেগম ইমা–*নারীর কৃতিত্ব (প্রবন্ধ)*
৪. শাহজালাল সুমন–*নারীর সম্মান (ছড়া)*
৫. আতিয়া মাহজাবিন–*আরশের আমানত (কবিতা)*

নির্বাচিত লেখকগণ নবীনকণ্ঠ'র ফেসবুক পেইজে যোগাযোগ করার অনুরোধ রইলো।

সৌজন্যে:

বাংলাদেশ নবীন লেখক ফোরাম

(শুদ্ধ লেখনীর ধারায় সুদূর অগ্রযাত্রা)

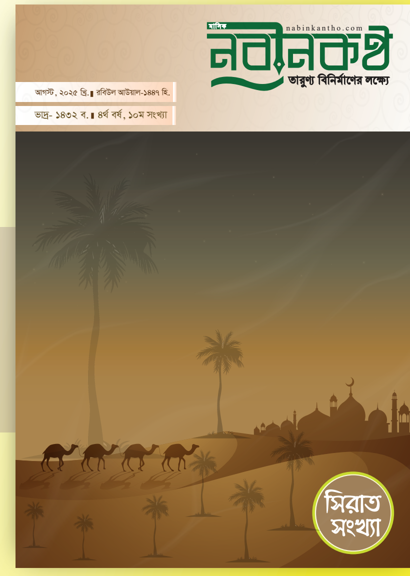

ব্যবস্থাপনায়

ও. এম. পাবলিকেশন্স

(তারুণ্যের সৃজনশীলতা বিকাশে দৃঢ় প্রত্যয়)

ইমেইল: nobinkanthobnlf@gmail.com
যোগাযোগ: 01789204674